আমার একটি মন আছে

"তাই আমার কোন দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, নেই কোন অভাব বোধ। আমি সুখে আছি কারণ মন তাই বলে"

শশাংকশেখর

প্রকাশক—
শ্রীশশাংকশেখর ভট্টাচার্য্য
৩নং চৌধুরী পাড়া, উত্তর পাড়া

প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৬০

মুদ্রাকর—
শ্রীশীতলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীধরনাথ প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

আমার একটি মন আছে

বিদ্রোহী মন। এ মন মানে না গতানুগতিকতার গতিসীমা, পুরাতনের পরাকাষ্ঠা, সংস্কারের সীমাবদ্ধতা। মহাশক্তি প্রকৃতিকে স্বীকার করেও এ মন বিশ্বাস করে না দেবদেবীর দৈব ঘটনার দক্ষতাতে, নতিস্বীকার করে না নীতি, কুনীতি আর দূর্নীতির কাছে। এ মন নাস্তিক, এর কোন ধর্ম নেই। এর একমাত্র ধর্ম সততার ধর্ম, সোজা পথে চলার সারল্য। তাই এ মনের স্থান সেই সমাজে।

—০—

—একটি বাঙ্গালী তরুণকে—

অধ্যায় ১

সহরতলির ছোট্ট বাড়ী। দেয়াল দিয়ে ঘেরা দুখানা মাঝারী ঘর আর রান্নাঘর, কলতলা। এর চার দেয়ালের ভেতর অমলার ছোট্ট সংসার।

শহরের আধুনিকতার ছাপ লাগে পোষাকে, আসবাবে, সাধারণ বিলাস উপাদানে। কিন্তু জন্মগত সংস্কার ও অকপট সরল বিশ্বাস নিয়ে অমলা ডুবে থাকে নিজের জগতে—ছোট্ট এই সংসারে।

স্বামী বরুণ এইমাত্র বেরিয়ে গেল বাজার করতে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সময় যেন কাটতে চায় না। গজ গজ করে বলে গেল—সারা পৃথিবীতে লোক কাজ করে সকাল থেকে। আমাদের এই দেশে পেট ভরে খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে কাজে গিয়ে ফল কতটুকু হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হলে অমলা গিয়ে খুলে দেখে পুরুতমশাই বুড়ো জীবন—ঠাকুর। "এই যে মা, তোমার ছেলের ঠিকুজী নিয়ে এলাম। ভাল করে রাশিনক্ষত্র দিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করতে একটু দেরীই হয়ে গেল।"

অমলা বসালো পুরুতমশাইকে। খেতে দিল একটু শুকনো সুপুরী, এলাচ।

"আমি মা, চা-টা আর ধরতে পারলাম না। ছেলে তো অনেক করে বলে। কিন্তু জানো মা, চা খেলে পেটের ভিতরটা নাড়ীশুদ্ধ কি রকম শুকিয়ে যায়। শুকনো পাতার রস তো! অথচ আমাদের ক'বরেজী বিদ্যেয় তো কত গাছ-গাছড়ার শেকড় দিয়ে তৈরী হয় কত ওষুধ আর অনুপান।"

"আপনার ছেলেটি কি করছে আজকাল?" জিজ্ঞেস করে অমলা।

"আর বল কেন। দিনরাত শুধু উচ্চ আশার বাণী শোনায় সবাইকে। বলে—বড় হবো, বড় চাকরী করবো, অফিসার হবো। বলে কি জানো? বলে সমাজ যে মোহ আর মর্যাদা দিয়ে গুটিকয়েক অফিসারকে ঘিরে রেখেছে তার সান্নিধ্য আমি কেন পাবো না? শোন ছেলের কথা! বি. কম্. পড়ছিস্, পাস করে একটা মাঝারী ধরনের সরকারী চাকরী পেলেই যথেষ্ট। দিব্যি আরামে বসে পড়ে বিয়ে-থা করে সংসার কর্। তা না। বলে উচ্চ আশা না থাকলে ছেলেদের কিছুই হয় না। ও টাকা চায় না। শুধু পজিশন, ষ্টেটাস্, কত কি বলে বুঝিও না। এদিকে আমি আর কত দিন খাটতে পারি। শহরের বাইরে একটু জমি-জমা করেছিলাম বলে সবাই খেয়ে বাঁচছিস্। তা না হলে কোথায় থাকতো তোর অ্যামবিশান। ওসব কি আর আমাদের পোষায়?

অমলা একটু রান্নাঘর থেকে ঘুরে এলো। পুরুতমশাই তার হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একটি নোটবুক। অমলার প্রথম সন্তান রাজীবের ঠিকুজী।

"ছেলের কিন্তু আরও আট বছর শনির দশা আছে মা," ঠাকুরমশাই বলেন।

অমলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি হবে তাহলে?"

"তুমি কিছু ভেবো না মা; মঙ্গলবার দিন ভোর বেলা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ওকেও স্নান করিয়ে একটা কালো সুতো দিয়ে কোমরে বেঁধে দেবে এই জালের কাঠি। মাছধরা জালের পাশে যে লোহার গুলতি থাকে, না? তাই। আমি পাড়ার জেলেদের কাছ থেকে নিয়েই এসেছি।"

অমলা কাঠিটা নেড়েচেড়ে দেখে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে রাখলো যত্ন করে। ভাবলো—সত্যিই তো গ্রহদেবতারা সন্তুষ্ট না থাকলে ছেলেটার জীবন দুঃখের হতে পারে। জালের কাঠিতে নিশ্চয়ই এমন মাহাত্ম্য আছে যাতে শনির কোপের শান্তি হবে। পুরুতমশাই তো তাই বললেন।

"বুঝলে মা, সব কিছুই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। এই তো তোমার কর্তা, এসব দেখে কি বলবে আমি জানি। কিন্তু আধিদৈবিক শক্তির যে একটা অস্তিত্ব আছে, সে তো তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

"ওর কথা আর বলবেন না। ও তো নাস্তিক। ওর সব কথা মেনে চললে আমাদের আর কোন আচারই মেনে চলা হয় না। আপনি একটু বসুন। বাজুটা পাশের বাড়ী খেলতে গেছে। নিয়ে আসি, ওকে একটু আশীর্বাদ করে যান—যেন ও বড় হতে পারে।"

"ও তো হবেই মা। জীবনের প্রতি পদে গ্রহের প্রকোপগুলো যদি এই ঠিকুজীতে লেখা মত শান্ত করে যেতে পারো, তবে তো বড় হবেই। খুব সুখে শান্তিতে জীবনটা কাটাবে তোমার ছেলে।"

"তা আমি করবোই, দেখবেন ওর কোন কথা আমি শুনবো না—যতই ঝগড়া করুক।"

"এই যে, কে ঝগড়া করলো আবার?" বলতে বলতে এসে ঢুকলো বরুণ, সাইকেলের ঝুড়িতে বাজারের মাছ তরকারী। "ঠাকুর-মশাই, কতক্ষণ এসেছেন?"

"এই তো এলাম বাবা। তোমার ছেলের একটা ঠিকুজী করে নিয়ে এসেছি। তা তুমি একটু দেবদ্বিজে ভক্তি রাখলেই তোমাদের মঙ্গল হবে বাবা।"

"কই অমঙ্গল তো কিছু দেখছি না। তাছাড়া, দ্বিজে ভক্তি না থাকলেও সম্মান আছে ঠিকই। তবে দেবদের অনেক কাজ। ওদের আর নাই বা ঘাটালাম। এই যে মন্দিরে মন্দিরে রাস্তায় ঘাটে গাছ আর পাথর বসিয়ে কত লোক মাথা খুঁড়ছে কত রকম প্রার্থনা নিয়ে, ওদের দিকে নজর দিতে গেলে আমাদের মত নাস্তিকের দিকে তাকানোরই সময় নেই ঠাকুর-দেবতাদের। এই তো সরস্বতী পূজোর ডামাডোলে কান ঝালাপালা হয়ে গেল মাইকে রাতদিন হিন্দী সিনেমার উর্দু গজল শুনে শুনে। ছেলেদের ভক্তি

আছে বলতে হবে। কত টাকা তুললো চাঁদা। পূজোর পরে বাঁচানো টাকায় মাংস-লুচি দিয়ে হবে ফিস্টি। আরও গান বাজবে, হৈ-হুল্লোড় হবে। আপনারা আর কি পেলেন মায়ের পূজো করে? একখানা আটপৌরে শাড়ী কিংবা গামছা আর গুটিকয়েক টাকা। আচ্ছা, এই বাবোয়াবী পূজো বে-আইনী করা যায় না?"

"বলছো কি বাবা! পূজো বেআইনী হবে এই রাম-লক্ষ্মণ-যুধিষ্ঠিরের দেশে? আমবা তাহলে খাবো কি?"

অমলা একটা চেয়ার বার করে এনে বললো—

"মিছিমিছি ওব সঙ্গে তর্ক করছেন আপনি। ওর কি এসব জ্ঞান আছে?"

"আছে, সবই আছে" বরুণ বলে, "তবে দেব-দ্বিজে ভক্তি শুধু আর একটা জেনারেশনই থাকবে। আপনাদের পরে আব কেউ পুরুত হবেও না, কেউ ওদের ডাকবেও না। এই তো আপনার ছেলে, ও কি পৈতৃক পেশা গ্রহণ করবে? কেনই বা করবে! দু'যুগ পরে দেখবেন বিয়ে হবে শুধু রেজিষ্ট্রী করে। পৈতে, শ্রাদ্ধ এসব আর হবেই না। আর ঠাকুরপূজোর নাম কবে বেলেল্লাপনাও বন্ধ হয়ে যাবে আপনা থেকেই। চাঁদা দেবে না তো কেউ। এই তো আমি এক পয়সাও চাঁদা দিই নি এবার। কি হোল আমার?"

"বলবো কি হলো?" অমলা বলে ওঠে, "হলো পাড়ার ছেলেরা আর তোমাকে কোন সাহায্য করতে আসবে না। আমি মরে গেলেও পোড়াতেও কেউ আসবে না।"

"আচ্ছা, আমি এবার আসি মা," বলে পুরুতমশাই উঠলেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে বরুণ তাঁকে বিদায় দিল সসম্মানে।

"আপনি আসবেন নিশ্চয়ই পুরুতমশাই। আপনার সঙ্গে আমার চিন্তাধারার তফাৎ অনেক। কিন্তু তবুও আসবেন। আপনার সংস্কারকে সংঘাত করে আমার অন্তর্দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হবে, এইই আমি চাই। আপনার চিন্তাকে আমি বুঝতে চাই, তার বিরুদ্ধে

দাঁড়াতে চাই। জানতে চাই কিসের বিরুদ্ধে আমার এই প্রতিবাদ। আসবেন নিশ্চয়ই আবার।"

*　　*　　*　　*

"এই দিদি, সিনেমায় যাবি? খুব ভাল একটা হিন্দী বই এসেছে রে। বলিস্ তো টিকিট নিয়ে আসি," দুপুরবেলা এসে বললো বন্নু অর্থাৎ বনমালী, অমলার আদরের ছোট ভাই। কাছেই থাকে, ওদের কাকার বাড়ীতে। দুপুরবেলা আসে, পারতপক্ষে জামাই-বাবুর সঙ্গে দেখা করে না, কারণ বড়ই উপদেশ দেন ভদ্রলোক। আজ ছুটির দিন ভিতরে শুয়ে বই পড়ছে, বন্নু জানতো না।

"আচ্ছা বন্নু," জিজ্ঞেস করে অমলা, "তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্চিস্ আজকাল। জানিস্ই তো তোর জামাইবাবু এসব প ছন্দ করেন না। হিন্দী সিনেমা দেখা বাদ দে, আর একটু পড়াশোনায় মন দে। দেখ্ তো পুরুতমশাইর ছেলে। ওর কত উচ্চ আশা। সমাজে বড় হওয়ার ইচ্ছা। সেদিন বলছিলেন ঠাকুরমশাই—"

"ওর কথা ছেড়ে দে দিদি, ও একটা ঘরকুণো বেয়াড়া ছেলে। দেখ্ না গিয়ে, দিনরাত বসে বসে কি-সব ইংরেজী বই পড়ে। আরে, ইংরেজী পড়েই যদি বড় হওয়া যায়, তবে বাংলা সাহিত্য রয়েছে কেন? ভারতীয় ভাষাগুলোর তা হলে কি হবে?"

"তা তুই পড়িস্ নাকি বাংলা বই।"

"আমার আর পড়ার সময় কই! ওসব নাকে-কান্না আমার ভাল লাগে না। এই যে জামাইবাবু—"

"এই যে শ্রীমান্ বনমালী," বরুণ বেরিয়ে এসে বলল, "শুনছিলাম ভাষা—সাহিত্য সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে। তা তিনটে ভাষাই শিখছো তো কলেজে? না কি কোনটাই শেখা হয় নি?"

"তা জামাইবাবু, আপনি ঠিকই বলেন। দুটো ভাষাই যথেষ্ট, ইংরেজী আর এই যেমন আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।"

"তা বটে। আর রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তো তোমরা সিনেমা দেখেই

শিখতে পারছো। আচ্ছা, এই উর্দু গানগুলো শুনে তোমরা যে নাচো মানে বুঝতে পারো তো ? না কি শুধু সুর ভেজেই খালাস ?"

"বুঝতে পারবো না কেন! আচ্ছা জামাইবাবু, দিদিকে একটা হিন্দী সিনেমা দেখতে নিয়ে যাই না ? ও তো ভালবাসে।"

"বেশ তো, যাক না, আমি তো আপত্তি করছি না।"

"না, আমি যাবো না," দিদি মুখঝামটা দিল, "তুই-ই যা, আমার অনেক কাজ।"

"আচ্ছা বেশ," বলে বনমালী পালালো।

* * * *

কাকা হরশঙ্করবাবু বাইরের ঘর থেকে চীৎকার করে ডাকছেন—

"অবিনাশ—অবিনাশ"

বনমালী পাশের ঘরে মাস্টারমশাই'র কাছে পড়ছিলো, অর্থাৎ, মাষ্টারমশাই বকে যাচ্ছেন আর বনু টেবিলের তলায় একমনে তাল ঠুকে যাচ্ছে। হঠাৎ শুনলো কাকাবাবুর ডাক। অবিনাশ বলে বাড়ীতে তো কেউ নেই। পাশের ঘরে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

"কাকে ডাকছেন কাকাবাবু ?"

"কাকে আবার হতভাগা, তোকেই তো ডাকছি এতক্ষণ ধরে। এই ভাঙ্গা বোতলটা ফেলে দিয়ে আয়।"

"যাচ্ছি, তবে আমার নাম তো অবিনাশ নয়।" কাকা কি বলবেন না শুনেই বনু বোতলটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল পড়ার ঘরে, আর মাষ্টারমশাই'র টেবিলের উপর রাখা একটা হাতে বোতলের ভাঙা কোণা দিয়ে একটা খোঁচা মেরে পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলো। কেটে গিয়ে মাষ্টারমশাই'র হাত থেকে গল গল করে রক্ত বেরোতে লাগলো।

কাকা 'নাম' সমস্যাটা সমাধান করতে বনুর ঘরে এসে অবাক্। বনু নেই। মাষ্টারমশাই হাতে ধুতির খুট চেপে ধরে বসে আছেন। মেঝেতে প্রচুর রক্ত।

"এ কি মাষ্টারমশাই, এত রক্ত কেন ?"

"ও কিছু না, একটু কেটে গেছে," আশ্বাস দেন মাষ্টারমশাই।

কাকাবাবুর আর 'নাম' সমস্যার সমাধান হলো না, অন্য সমস্যা এসে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওর মাথা আরও তালগোল পাকিয়ে দিয়ে।

"কাকীমা, শীগ্‌গির ভাত দাও। কলেজের বেলা হয়ে গেছে," বন্নু এসে বসলো রান্নাঘরে।

"সে কিরে, আজ কলেজ ছুটি না ?"

"ছুটি তো এখন রোজই। ইলেকশনের মিটিং হবে যে কলেজ ইউনিয়নের। আর পরেশটা যা সুন্দর টুইস্ট্ নাচে না কাকীমা, দেখলে অবাক হয়ে যাবে তুমি।"

"তবে মিটিং বললি যে," কাকীমার প্রশ্ন।

"ওই তো, মিটিংই তো হবে। তবে তার আগে একটু রেকর্ড বাজিয়ে নেচে নেচে আমরা শরীরটা একটু চাঙগা করে নিই তো। হবু প্রেসিডেণ্ট রোজই তো চপকাটলেট খাওয়ায়। ও সব তুমি বুঝবে না।"

"থাক্ বাবা আমার আর বুঝে কাজ নেই। তোর বাবা আসছেন কালকে। তাঁকে যে কি বলবো জানি না।"

"খবরদার কাকীমা। বাবাকে আবার কলেজে পাঠিয়ে দিও না যেন। ও সব উনি বুঝবেন না। ওদের যুগ আর আমাদের যুগে অনেক তফাৎ। ওদের তফাতে থাকাই ভাল। চলি—" বলে নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে উঠে গেল বন্নু, আর সাইকেলটা নামিয়ে একলাফে উঠে বসে উধাও হয়ে গেল।

কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন—"ওরে ও কমলেশ, পেছনের চাকায় হাওয়া নেই যে একটুও, এই দাঁড়া কি নাম তোর"। ততক্ষণে ছদ্মনামী ভাইপো উধাও হয়ে গেল রাস্তার মোড় ঘুরে।

* * * *

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরলো বরুণ। অমলা বেরোতেই জিজ্ঞেস করল—

"ঘরে কে গান গাইছে বল তো ?"

"ও! সোনালী এসেছে গো, আমার অনেক পুরোনো বন্ধু। এসো আলাপ করবে।" ঘরে এল বরুণ। সোনালীকে দেখলোও। দিব্যি ফিটফাট, পরিষ্কার রুচি। বিয়ে হয়নি। কিন্তু নাভির নীচে শাড়ী পরা আর পেটকাটা ব্লাউজের উগ্রতা নেই। অমলা পরিচয় করিয়ে দিল। বরুণ বসলো দেয়ালের পাশে চেয়ারে। গান থেমে গেছে ও আসতেই।

সোনালীই আলাপ স্থুরু করলো। বেশ সপ্রতিভ মেয়ে।

"আপনার কথা শুনলাম এতক্ষণ ধরে অমলার কাছে। অনেকদিন পর দেখা কি না। আপনাদের মত লোককেই আমার ভাল লাগে। সব কিছুতেই একটা ব্যক্তিত্ব, একটা স্বাধীন চিন্তা, একটা নতুন ধারার ভাবাবেগে।"

"ও, এতটা শুনে ফেলেছেন ? কিন্তু আর একজনের ব্যক্তিত্ব বুঝতে নিজের যে মননশীলতা থাকা দরকার তা আপনার আছে বলেই তাকে ওভাবে আঁচ করতে পেরেছেন। তা আমার বাতিক-গুলোর কথা শুনেছেন কি ?"

"তা আর শুনিনি ? এসেছি তো সেই দুপুরবেলা। দেখুন, আমি কিন্তু ওগুলোকে বাতিক বলবো না। আর আপনাকে নাস্তিক বলার সাহসও আমার নেই। কারণ আস্তিকের অস্তিত্বে বিশ্বাস অবিশ্বাসের টানা-পোড়েনে এই সব চিন্তা আমি অনেক দিন আগেই দেড়ে দিয়েছি। অনেক বইতে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু জবাব পাই নি। ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করার পর ভাবলাম রিসার্চ করবো। কিন্তু মনটা এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে, এখন এসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরী নিয়ে সকাল-বিকেল অফিস করেই দিন কাটাচ্ছি। মনকে মুক্তি দিয়েছি।"

"ভালই করেছেন" বরুণ জবাব দেয়, "তা না হলে শান্তি পেতেন না কোন কালে। এই যে চার দিকে দেখি অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে আছে বেশীর ভাগ মানুষ—কি পায় ওতে ওরা! অবশ্য এইসব সংস্কারে মনের একটা দিক ভরে আছে বলেই হয়তো নানা অসুবিধে, অনটন আর জীবনে আনন্দের অভাবটা মিটিয়ে রাখে, ভুলিয়ে রাখে। ওতেই ওরা সুখ পায়, নয় কি?"

"হ্যা", অমলা জবাব দেয়, "তাছাড়া সংস্কার সবারই আছে। তুমিও কিছু বাদ যাও না। একেই আমি বলি বাতিক। এই যেমন তুমি সাধু-সন্ন্যেসী দেখলেই হাসো বা ভিখিরী দেখলে রেগে ওঠো। কেন? সবার দয়াতেই তো ওরা বাঁচতে পারে। ভিক্ষে কেউ সখ করে করে না। আর অন্ধ-খঞ্জরা কার দয়ায় জীবনধারণ করবে? আমাদের, যাদের ভগবান্ সামান্য কিছু বাড়তি দিয়েছেন—"

"বাড়তি আর দিলেন কই?" প্রশ্ন করে বরুণ।

"সেটা তোমারই দোষ" রেগে বলে অমলা, "তুমিও তো গোঁ ধরে বসে আছো - বাড়তি একটা পয়সা নেবে না কারও কাছে। কত লোক কত সুবিধে করে নিল সরকারের টাকায়। এক তুমিই পথের একপাশে সরে রইলে"

"সোজা পথের পাশে বল" জবাব দেয় বরুণ, "পথ তো অনেক আছে। অর্থনীতির একটা দিকই হলো উৎপাদন। কিন্তু সরকার তো উৎপাদন কিছু করে না। শুধু খরচ করে। আর সেই খরচে ভাগ বসাতে সবাই ওৎ পেতে বসে আছে। এই ভাগের একটা বড় অংশই তো অনেক হাত-বদল হয়ে ছড়িয়ে যায়।"

"সেটাই আমার কথা। সবাই যখন ওতে ভাগ বসাতে পারছে তবে তুমি একলা বাদ যাও কেন? তোমার মান? কিন্তু তুমি বোঝ না, মান কাকে বলে? সরকারী পদে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবাই যদি এক পথে যায়, তবে তুমি তোমার বেয়াড়া বাতিক নিয়ে পথের পাশে সরে থাকলে তুমিই ঠকবে। আর মান? ওতে বরং মান

যাবে তোমার। কার কাছে তোমার মান? তুমি একগুঁয়ে হয়ে থেকে ওদের সবাইকে করুণার চোখে দেখলে ওরা কি তোমাকে সম্মান করবে?"

"কিন্তু আমার মনের একটা তৃপ্তি? আমি মনকে বোঝাই কি করে?"

"সেটা খুব সহজ। তুমি তো কিছু চুরি জালিয়াতি করছো না। সরকারের যে সম্পদ নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেলছে, তার ছিটেফোঁটা যদি তোমার পাতে এসে পড়ে, কেন তুমি কুড়িয়ে নেবে না? যারা কোন সুবিধে সুযোগ করে নিতে পারে তারাই সেই সুযোগ যারা করে দেয় তাদের হাতে ঐ ছিটেফোঁটা তুলে দেয়। আর সুযোগ করে দেওয়াটা ওদের কাজের মধ্যেই পড়ে। বাধা পথ থেকে একটুও সরে যেতে হয় না ওদের। তুমি যদি সেই কাজ না কর তবে অন্যরা করবে। তাদের কাছেই যাবে ওরা।"

সোনালী এতক্ষণ ধরে ওদের তর্ক শুনছিল। এবার ও যোগ দিল —"এই যে জিনিসপত্রের এত দাম। বাড়ীতে তো দেখছি, শুধু পেট ভরে খেয়ে বাঁচতেই তো সব টাকা খরচ হয়ে যায়। তা না হলে আমরা সব ভাইবোন মিলে মাসে কম রোজগার করি না। টাকার তো কোন কমতি নেই। কালোবাজারী কেন হয়? লোকের হাতে টাকা আছে বলেই না কালোবাজারের দামে জিনিস কেনে।"

"এটা সত্যিই" বরুণ আবার যোগ দেয়, "নানা কারণে আর অজুহাতে সরকারের অনেক বাড়তি টাকাই লোকের হাতে ঘুরছে।"

"তাইতো বলছি" অমলা বলে, "অর্থনীতি আমি বুঝি না। কিন্তু সবার হাতেই যে টাকা ঘুরছে সেটা আমিও বুঝি। তবে একটা হাতই শুধু দেখছি খালি থেকে যায়। ওতে টাকা ঘুরে এসে পড়ে না। চল, ওঠো এবার খাবে চল।"

সবাই উঠলো। খাবার সময় হয়ে গেছে।

* * * *

"জয় বাবা তারকনাথ।"

লোকাল ট্রেনের ভিড় ঠেলে গেরুয়া-পরা সাধুবাবা একটা কাঁচে বাঁধানো পট তুলে ধরলো এক কোণে বসা বরুণের সামনে। কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ না দেখে পটটা আবার নেড়ে ধরলো সামনে।

"জয় বাবা তারকেশ্বরের জয়।"

গম্ভীর হয়ে বসে রইলো বরুণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। রাগে ওর কান দুটো লাল হয়ে উঠলো। পাশের ভদ্রলোক টপ করে পাঁচটা পয়সা ফেলে দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন দুহাত জুড়ে। আশপাশ থেকে টপাটপ পয়সা পড়ে পড়ে ঢেকে গেল বাবার ছবিখানা। সাধুবাবা প্রস্থান করলেন অন্য ভক্তের খোঁজে।

"কি দাদা, খুব রেগে আছেন দেখছি", মন্তব্য হলো পাশ থেকে।

"আরে সবাই তো ভক্তি ধর্মজ্ঞান নিয়ে জন্মায় নি", আর একজন টিটকারী দিলেন।

"নাস্তিক, নাস্তিক"। "খৃষ্টান নাকি রে?"

"কি দাদা, অমন গুম হয়ে বসে আছেন কেন? কিছু একটা বলুন, আমাদের যে বড় অশান্তি হচ্ছে।"

আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না বরুণ। বিনীতভাবে বললো—

"দেখুন, আপনারা আপনাদের বিশ্বাস নিয়ে থাকুন। আমিও হিন্দু। কিন্তু এই সব ভাঁওতা ধর্মের নামে শোষণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মন এতে সায় দেয় না।"

"আপনি কোন্ পার্টির লোক দাদা?"

"না" জবাব দেয় বরুণ, "আমি কোন পার্টির লোক নই। আমি একজন সরকারী কর্মচারী। রাজনীতি আমি করি না। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস আর ধাপ্পাবাজী দেখলে আমার দুঃখ হয়, রাগও হয়।"

"বটে, কোথাকার সংস্কারক এসেছেন রে" বলে একজন ওর সার্টের কলার চেপে ধরলো। আর একজন এক ধাক্কায় ঠেলে দরজার দিকে

সরিয়ে দিল ওকে। বাধ্য হয়ে মাঝ রাস্তার ষ্টেশনেই নেমে গেল বরুণ।

অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছলো তখন দেরী হয়ে গেছে অনেক। নিজের মনে বসলো কাজ করতে। কাজ নিয়েই মেতে রইলো। কোথা দিয়ে বিকেল হয়ে গেছে বুঝতেই পারলো না।

সহকর্মী খবর দিলেন, "পাষাণ এসেছিলো।"

"পাষাণ ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে বরুণ।

"হ্যাঁ, ওই যে যার হাত থেকে কখনও রস গলায় না। 'বালিধারা' প্রোজেক্টের কণ্ট্রাক্টার। দেখলাম আপনার ড্রয়ারটা টেনে কি একটা রেখে গেল। তা দেখুন না খুলে।"

বরুণ ড্রয়ার টেনে বার করলো মুখ খোলা একটা খাম। বেশী নয়, দুখানা একশো টাকার নোট।

সহকর্মী গেয়ে উঠলেন—"না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। হয়েছে তো এবার ?"

বরুণ বসে রইলো গম্ভীর হয়ে। খামটা হাতেই থেকে গেল। একটু যেন হাতটা কাঁপছে।

"কার উপর রাগ করবেন মশাই ?" বলে সহকর্মী হাতটা এগিয়ে খামটা তুলে নিয়ে আলগোছে একখানা নোট তুলে পকেটে রেখে খামটা আবার ফিরিয়ে দিলেন বরুণের হাতে। বললেন,

"লাভের গুড় মশাই পিঁপড়েয় খায়। আপনি বোধ হয় দুটোই ওকে ফিরিয়ে দেবেন। তাই একটা আমার কাছে গচ্ছিত রইলো আর কি। আমিই ফিরিয়ে দেবো ওকে যদি চায়। তবে চাইবে না। বরং ওইটাও আমারই হাতে চলে আসবে। দেখা যাক বানের জল কদ্দূর গড়ায়।"

বরুণ অসাড় হয়ে বসে রইলো। মনের মধ্যে বইছে ঝড়। অজান্তে হাতখানা পকেটের ভেতর ঢুকে আস্তে করে নামিয়ে দিল খামটা। হাতটা উঠে এল আবার টেবিলের উপর। সন্ধ্যে হলো। একলা ঘরে বসে রইলো বরুণ একরাশ চিন্তা নিয়ে।

*　　*　　*　　*

"জালের কাঠি একটা তোমারও দরকার।" মন্তব্য করলো অমলা, খামটা দেখে।

*　　*　　*　　*

"জালের কাঠি, জালের কাঠি" বলে বলে জড়িয়ে ধরলো বাবাকে এসে, রাজীব।

"দেখেছ বাবা আমার জালের কাঠি ? এটা পরলে কি হয় ?"

"হয় কুসংস্কার আর দেহাতী ঢং" জবাব দেয় বরুণ।

"কুসম্‌কার মানে কি ? মা, ঢং মানে কি ?"

অমলা এসে দাঁড়িয়েছে, রাগ হয়েছে।

"দেখো, তোমার বাতিকগুলো আবার ছেলেটাকেও ঘসে লাগিয়ে দিও না। ও আমি যা বলবো শুনবে। আর একটু বড় হলে তোর আমি পৈতে দেবো সোনা আমার"

"হ্যাঁ মা, কিন্তু আমি ন্যাড়া-মাথা হব না।" দৃঢ় ভাবে জবাব দেয় রাজীব। ও এ ব্যাপারে আগেই মন ঠিক করে ফেলেছে।

"আর পৈতে কানেও দেবো না—বলে দিচ্ছি আগে থেকেই কিন্তু।" রাজু বলে।

"কি হবে পৈতে দিয়ে ?" তর্ক করে বরুণ চক্রবর্তী, "দু-দিন পরেই তো খুলে ফেলে দেবে আমার মত।"

"ইস, ফেললেই হলো। ব্রাহ্মণের ছেলে বলে চেনা যাবে কি করে ?" অমলা জিজ্ঞেস করে।

"চেনা যাবে না, দরকারও নেই। ব্রাহ্মণত্ব তো চলেই গেছে আজকাল। কি হবে ওসব করে। টেরিলিন সার্ট আর প্যান্ট পরলে সবাইকেই একই রকম দেখায়। ভেতরে একটা পৈতে রেখে কি লাভ ? আজকাল তো ফ্যাক্টরী আর অফিস থেকে এসেই লুঙ্গী পরে বসে ব্রাহ্মণের ছেলেরা—" মন্তব্য করলো বরুণ।

অধ্যায় ২

কোলকাতা থেকে মাষ্টার মশাই এসেছে। বি. এ. পাশ ছোকরা। গ্রামের সব স্কুলের ছেলেদের একসাথে পডাবে। মাইনে থোক একটা দেবে সবাই, এরকম একটা আন্দাজ করে দিয়েছেন জীবন ঠাকুর, গ্রামের পুরুতমশাই। উনিই ব্যবস্থাটি কবেছেন।

বর্ধিষ্ণু চাষী নস্কব মশাই বলছিলেন "আপনাব বোধ হয় কষ্ট হবে মাষ্টার মশাই। তা খাওয়া দাওয়া কি আপনি নিজে রান্না করে খাবেন ? বামুনেব ছেলে। পুরুতমশাই'র বাড়ী আবার গ্রামের একেবারে বাইরে। অনেক দূর পড়বে।"

মাষ্টার শিবব্রত বিনীতভাবে বলে—

"ও আপনি কিছু ভাববেন না। আমি আপনাদের যে কোন কারও বাড়ীতেই খেতে পারবো। আমি জাতিভেদ মানি না।"

"আপনি না মানলেও আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো! আপনার জাত মারলে আমাদের অধর্ম হবে যে।"

"কি করে হবে ? আমার জাত তো অনেক আগেই চলে গেছে। আপনারা নতুন করে মারছেন না তো।"

"তাহলে তো আমাদেরই জাত যাবে বলুন", রসিকতা করলেন নস্কর মশাই, "যাকগে, আমরা নিমিত্ত না হোলেই হলো। আপনি তাহলে আমার বাডীতেই খাবেন। এখন বিশ্রাম করুন। এই দোকানেই থাকবেন ও পড়াবেন আপনি। আমার ছেলের ওষুধের দোকান। পাশে একটা খালি কামরা আছে। ছেলে আসবে একটু পরে, সন্ধ্যেবেলা। ও কম্পাউণ্ডারি পাশ কিনা! সবাই ওকে ডাক্তার বলে। রুগী দেখতে গেছে এখন পাশের গাঁয়ে।"

পাশে চায়ের দোকানে সন্ধ্যেবেলা বেশ ভীড়। মাষ্টার মশাইও

এক গেলাস চা খেয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করে এলো। বেশ ভাল লাগছে।

পরদিন সকাল বেলা বারান্দায় বেঞ্চের উপর বসে দাড়ি কামাচ্ছিল মাষ্টার মশাই। সামনে ছোট একটা আয়না, চার পাশে অগুণতি ছোট ছেলেদের ভীড়। নতুন লোককে দেখতে এসেছে সবাই।

"মাষ্টার বাবু, আপনি 'ওজ' দাড়ি বানাও?" প্রশ্ন করে ওদের একজন।

"ও, রোজ কামাই? না একদিন পর পর। আচ্ছা এখানে পাইখানা কোথায় বল্‌তো রে।"

"আপনি গাছে উঠতে পারেন?"

"আমি বলছি পাইখানার কথা।"

"আমিও তাই বলছি গো মাষ্টার বাবু। দিনের বেলা যদি যেতে হয় তো ঐ গাছের উপর একটা জায়গা বানানো আছে নালাটার উপর। কিছু দেখা যাবে না। না হলে ওজ ভোরবেলা যেতে হবে অন্ধকার থাকতে, ঐ রেলের পুলের উপর বা রাস্তার ধারে।"

মাষ্টার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বড় রাস্তা আর এক পাশে রেল লাইনের দিকে।

"এই যে, মাষ্টার মশাই, এসে গেছেন দেখছি" বলতে বলতে পুরুত মশাই এসে বসলেন বেঞ্চের উপর, "সব ঠিক আছে তো? কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না, সব ঠিকই আছে" সন্দিগ্ধভাবে জবাব দেয় মাষ্টার। মনে মনে ঠিক করলো একমাসের মাইনেটা পেয়েই বাসে উঠে বসবে। কোলকাতাই ভাল। আর যা হোক, পাইখানার জন্যে গাছে উঠতে হবে না তো?

দোকানের মালিক নস্কর ডাক্তার চেয়ারের উপর পা তুলে বসে সিগারেট খেতে খেতে বলছিলো,

"বুঝলেন মাষ্টার মশাই, এই পাড়াগাঁয়ে আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। বিশেষ করে রাত্তির বেলা।"

"সেকি ডাক্তারবাবু, বাঘ ভালুক নেই তো এখানে।"

"না তা নেই, তবে সাপ আছে অনেক।" মাষ্টার মনে মনে ঠিক করলো গাছেই উঠবে তা দিনেই হোক বা রাত্তিরেই হোক।

"কিন্তু সাপের চেয়েও বেশী ভয়ানক মশাই মেয়েছেলে। ঐ যে পুকুরের ধার দিয়ে মেয়েটা যাচ্ছে দেখছেন, ও বালবিধবা। কিন্তু বৈধব্যের কিছু দেখতে পাচ্ছেন ওর গায়ে?" মাষ্টাব বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ কবলো মেয়েটাকে। কিন্তু সাদামাটা একটা সহজ সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। পরণে কালোপেড়ে ধবধবে সাদা শাড়ী, হাতে একটা বালতি, পা খালি সবার মত।

"মেয়েটা ভীষণ তেজী", বকে যেতে লাগলেন ডাক্তার বাবু, "ঘাটে চান করতে গিয়ে ভাসুরকে জলে দেখে ওর নাম ধরে ডেকে হুকুম দিয়েছিলো উঠে যান, আমি নাববো। আর শ্বশুর শাশুড়ীকে যা শাসন কবে, ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারে না ওর সামনে। আমি মশাই পোড় খাওয়া গরু।" বাকী গল্পটা উহ্য রইলো।

অনেকক্ষণ ডাক্তার আর কিছু বলছেন না দেখে মাষ্টার বললো "চলুন, চান করতে যাওয়া যাক, বেলা তো হলো।"

"ওরে বাবা, আরও এক ঘণ্টা লাগবে ওর। আর পুকুর তো এখানে একটাই। আমি মশাই ওর ধার কাছ দিয়ে যাচ্ছি না। একবার—"। হঠাৎ কাজের কথা মনে পড়ায় ডাক্তার পা নামিয়ে বসলেন।

গুমোট গরম। একলা ঘরে একটা হাতপাখা নিয়ে সহজ নির্লজ্জ ভাবেই ঘুমিয়েছিল মাষ্টার। মাঝরাতে হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একলাফে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। আবার নিজের আধঢাকা শরীরের দিকে নজর পড়তেই ঢুকে গেল ভেতরে আর জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরে কি হচ্ছে দেখতে।

বাইরে বেশ ভীড়। জনা ছয়েক ছেলে আর দুটি মেয়ে। এক সঙ্গে কি যে বলছে বোঝবার উপায় নেই। আস্তে আস্তে ভীড়টা

সরে গেল রাস্তার উপর দিয়ে আর মশার তাড়নায় মাষ্টারও গিয়ে ঢুকলো বিছানায় আর কান খাড়া করে রইলো বাইরের দিকে।

ঘুম আসার আগেই আবার চীৎকার শুরু হোল। এবার ধুতিটা পরে বেরিয়ে এলো মাষ্টার মশাই।

"ওখানে দাঁড়িয়ে বাপের বিয়ে দেখছো নাকি, ধর না ছোঁড়াটাকে" চেঁচিয়ে উঠলো একটা বুড়ি ওর দিকে তাকিয়ে। থতমত খেয়ে মাষ্টার আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ করার আগেই হুড়মুড় করে ওর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল একটি যুবতী মেয়ে।

"এই, এই, কি করছো? ওখানে ঢুকছো কেন, এই—"

"নতুন নাগর এয়েছে যে," বাইরে মন্তব্য। আরও চেঁচামেচি, আরও শাসানো।

মাষ্টার তাড়াহুড়ো করে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দেখে মেয়েটা এক কোণে নির্বিকার দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে।

"ওহে মাষ্টার, বের করে দাও তো ওকে ভালোয় ভালোয়" শাসিয়ে উঠলো গুণ্ডামত একজন লোক।

মাষ্টার আরও ভয় পেয়ে গেল। মেয়েটার কোন ভাবান্তর নেই যেন। আমতা আমতা করে মাষ্টার বললো,

"আ—আমি তো ওকে ঢোকাই নি"

"না, ঢোকাও নি, দেবো মাথাটা ফাটিয়ে; এই হতচ্ছাড়ী, আয় বেরিয়ে"—বলে গুণ্ডা লোকটা এসে ঘরে ঢুকলো আর হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে কি যে বলছে বুঝতেই পারলো না মাষ্টার। তাড়াতাড়ি শক্ত করে কাঠের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ভেবে ভেবে ঠিক করলো আজকের রাতটা কোন মতে ভালোয় ভালোয় কাটলে কালই কোলকাতায় পাড়ি!

ভোর বেলা ডাক্তারবাবু এসেই মাষ্টারকে বললেন—"বলেছিলাম না, সাবধানে থাকবেন, বিশেষ করে রাত্তির বেলা। তা কি হয়েছিল বলুন তো?"

"হয়নি বিশেষ কিছুই, তবে হোতো।" মাষ্টার বলে, "জাত তো অনেক আগেই গেছে, এবার প্রাণও যাবে দেখছি এই অজ পাড়া গাঁয়ে।"

"ইস্-স্, কি যে বলেন মাষ্টার মশাই। আমরা থাকতে—তা আপনার জাত কি করে গেল বললেন না তো।"

"ওটা গিয়েছিল, মানে খুইয়েছিলাম ইচ্ছে করেই। বয়স্কাউট হয়ে জাম্বুরীতে গিয়ে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে ভাত খেয়েছিলাম। তাই আমার কাকামশাই গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু জাত আর ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। দেখুন, আমি আজই বিকেলে এখান থেকে চলে যাবো। আপনারা অন্য মাষ্টার দেখে নেবেন --" বলে মাষ্টাব মুখ ধুতে চলে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো নস্কর ডাক্তার।

দুপুর বেলা খাওয়ার পর পুরুত মশাইর বাড়ীতে মাষ্টারকে নিয়ে এল নস্কর ডাক্তার। পুরুত ঠাকুর যজমানে গেছেন। তাই তাঁর ছেলে জিতেন্দ্র ওকে বসালো আদর করে। কোলকাতার কোন এক বাড়ীতে জিতেন খাওয়া থাকার বদলে ছেলে পড়ায়। তাই এখনও আলাপ হয় নি।

মাষ্টার রোজই একবার করে বলে চলে যাবে—কিন্তু যাওয়া আর হয় নি। আজ ঠিকই চলে যাবে বলে এসেছে পুরুত মশাইকে বিদায় জানাতে।

"কিন্তু বাবাতো আজ ফিরবেন না"—জিতেন্দ্র খবরটা দেয়; ওরা জানতো না।

"তার মানে আজও যাওয়া হোল না মাষ্টার মশাই," টিপ্পনী কাটে ডাক্তার। জিতেন অবাক হয়ে গেল। বললো, "এই তো সেদিন এলেন শুনলাম বাবার কাছে, চলে যাবেন এরই মধ্যেই?"

"দেখুন তো, কি করে যাবেন আর কেনই বা যাবেন?" আমরা যেতে দিলে তো।" ডাক্তার নিশ্চয়ই জানে যাওয়া হবে না।

"কি ব্যাপার বলুন তো মাষ্টার মশাই ?" জিজ্ঞেস করে জিতেন।

শিবব্রত সেদিনের কথা সব বললো। জিতেন তখন নিজেরও একটা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল, যা এতদিন কাউকেই বলেনি।

"আমি যে বাড়ীতে ছেলে পড়িয়ে থাকি কোলকাতায়, সেখানেও ঠিক একই বকম ব্যাপার হয়েছিল একদিন রাত্রে। হঠাৎ মাঝরাতে দরজায় জোরে ধাক্কা। উঠে দোর খুলতেই ওদের বাড়ীর ঝি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো আমার ঘরে। মনে হোল ভয়ে কাঁপছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস কবতে বললো, 'ঐ বুড়ো, তোমার ছাত্রদের বাবা, আমাব ঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল গো। তা আমি ঔই বুড়োর কাছে কেন যাবো বলতো মাষ্টার বাবু তোমাদেব মত জোয়ান মরদ থাকতে।' অমি তো কোনমতে ঝি টাকে এক রকম জোর করেই ঘর থেকে তাড়ালাম।"

"আরে আমিও তো তাই বলি,"—যোগান দিল নস্কর ডাক্তার, "আমারও এরকম ব্যাপার হয়েছিল অনেকবার। মেয়েদের থেকে মশাই দূরে থাকাই ভাল। কিন্তু কি করে থাকবেন ? এই যেমন আপনারা, বুড়ো হয়ে যাবার আগে বিয়েই করেন না। আপনাদের কাঁচা বয়েস দেখে মেয়েগুলো হন্যে হয়ে এসে পড়ে—তা বাড়ির ঝি-ই হোক, আর খারাপ মেয়েই হোক। আমি যেমন, ঘরে বউ থাকতে····যাকগে, আমার কথা থাক। তা আপনারা বিয়ে করে নিচ্চেন না কেন বলুন তো ?"

"জীবনে একটা পথ বেছে নেবার আগেই কি গলগ্রহ জোগাড় করে ঝুলে পড়া যায় ?" প্রশ্ন করে জিতেন।

"ঠিক কথা" —বলে সায় দেয় শিবব্রত।

"থাকগে, না করুন আপনারা, আমার কি আসে যায় ?" উপসংহার করে ডাক্তার

জিতেন ফিরেছে কোলকাতায়। সন্ধ্যেবেলা একলা ঘরে বসেছিল বিছানায়। পাশের বিছানা খালি। ওর ছাত্র বাড়ীতে নেই।

হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে মেঝেয় এসে পড়লো একখানা খাম। এক লাফে উঠে গিয়ে জিতেন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো বারান্দা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হলদে শাড়ী পরা মেয়ে, ওর ছাত্রর দিদি, পিসতুতো বোন। এসেছে দুদিন থাকবে বলে।

খামখানা নিয়ে এসে বিছানায় বসলো জিতেন। ওতে কি আছে বুঝতে দেরী হলো না। বসে বসে ভাবতে লাগলো মেয়েটির কথা। বয়েস বেশ হয়েছে—বিয়ে হয় নি। প্রেমের অঙ্কুর গজিয়ে গজিয়ে শুকিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বেচারা!

খামটা খুলে ধীরে সুস্থে পড়লো চিঠিটা। "তুমি আকাশের চাঁদ, আমি মাটির ফুল, কুড়িয়ে নেবে না আমায়?" ইত্যাদি আরও অনেক কথা। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। আগে জীবন গঠন, পরে প্রেম। এখনও সময় হয় নি মনকে বিলিয়ে দেওয়ার। তবে দেহের একটু স্পর্শ নিতে দোষ কি?

মেয়েটি আবার আসবে, জিতেন জানতো। পরদিন সন্ধ্যেবেলা আবার বসেছিল একলা ঘরে। পাশেই নিরিবিলি ছাদ। মেয়েটি ছাদের দূর কোণায় এসে জিজ্ঞেস করলো "এলাচ খাবেন?"

একলাফে উঠে এলো জিতেন। চারিদিক দেখে নিয়ে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো ললিতাকে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড হাতুড়ী পিটছে।

আস্তে করে ললিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। রেলিং-এর পাশে সরে গিয়ে বললো,

"দিদিমা কি বলছিলেন জানেন? বলছিলেন আমরা যদি এক জাত হোতাম, আপনি যদি ব্রাহ্মণ না হতেন।"

"জাতে তো আমার কিছু আসে যায় না ললিতা। আমি জাত মানি না। কিন্তু সমস্যা তো সেটা নয়। প্রেম, বিয়ে সংসার এসব কথা ভাববার সময় হয় নি এখনও আমার।"

"কিন্তু তাহলে আমার কি হবে? আমি যে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

"তবে এসোনা আমার কাছে আবার। তোমার দেহটাকে যে বড় স্নুন্দর লাগছে।"

"ঐটাই আপনার ভুল। আপনার শুধু দেহের উপর লোভ। মেয়েদের মন আপনি বোঝেন না। আপনি এত স্নুন্দর। তাই আপনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কি লাভ? আপনার মন আমি পাবো না।"

"কি করে বুঝবো বল। তুমিই তো একমাত্র মেয়ে যে আমার আলিঙ্গনে প্রথম ধরা দিলে। দাও না তোমার এলাচ আর একটু।"

"নিন" বলে ললিতা এগিয়ে এল। জিতেন ওর হাত ধরে টেনে আবার জড়িয়ে ধরার আগেই ললিতা এক ঝটকায় ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিছানায় বসে জিতেন ওর কথা ভাবতে লাগলো।

ললিতা চলে গেল পরদিন। দুদিন পর ডাকে একটা চিঠি এল ওর—

"আপনি আমাকে ভুলে যাবেন। আমার কিন্তু সেদিনের সন্ধ্যার স্মৃতি চিরদিন মনে আনন্দ দেবে। ইতি।"

হঁ্যা, ভুলে যাবে ঠিকই। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে, অল্প কিছুদিনের জন্যে, মনটাকে চঞ্চল করে দিয়ে গেল একটি অচেনা মেয়ের কোমল স্পর্শ, একটু অযাচিত আত্মদান, একটি নিষ্ফল প্রেমের ব্যর্থ আমন্ত্রণ।

* * * *

পাড়াগাঁয়ের বাস উঠিয়ে মাষ্টার ফিরেছে কোলকাতায়। জিতেনের সঙ্গে আলাপ ঝালিয়ে ওর বন্ধু হয়েছে শিবব্রত, হয়েছে শিবুদা।

"কাল চল শিবুদা আমার এক দাদার বাড়ী বেড়িয়ে আসি, বরুণদা" প্রস্তাব করে জিতেন্দ্র।

"কোথায় যেতে হবে?"

"বেশী দূরে নয়, সহরতলিতে।"

"ওরে বাবা, আবার সহরের বাইরে?" শিবু ভয় পেয়ে গেল।

"না, এ পাড়াগাঁয়ের মত নয়" আশ্বাস দেয় জিতেন, "গ্রামের সৌম্যতা আর সহরের জৌলুস, তুইই পাবে।"

"থাক, আর সৌম্যতার দরকার নেই। খুব শিক্ষা হয়েছে একবার।" সাফ জবাব দেয় শিবব্রত।

"আরে, এ সে রকম নয়। তাছাড়া বরুণদা আমার আদর্শ। ওর কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। দেখবে।"

পরদিন বিকেলে ওরা দুজন এসে হাজির হলো বরুণের বাড়ী। বনুও রয়েছে সেখানে।

"এই যে বনু। তুমিও রয়েছ দেখছি, ভালই হলো। বরুণদা এলে আবার আমাদের ঝগড়া সুরু করা যাবে।"

"কিসের ঝগড়া ?" জিজ্ঞেস করে শিবু।

"আচ্ছা বনু, এই শিবুদা আমাদের থেকে সিনিয়র। আর এ হলো আমার বিশেষ বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বনমালী। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের একটা ঝগড়া চলছে; জীবনের আদর্শ নিয়ে। বরুণদা কিন্তু আমার মতেই সায় দেন আর বনু যায় রেগে। অথচ ওর কাছ থেকে বই ধার করে আমি কলেজের পড়া করি।"

"হ্যাঁ, আমার বই পড়েই প্রত্যেক বার তুমি পাশ করছো, অথচ আমি কোনমতে টেনে চলেছি। জানেন শিবুদা, ওর একখানাও বই নেই। মুশকিল হয় পরীক্ষার আগে। কিন্তু ও দুদিন আগেই পরীক্ষার বিষয়ের বইগুলো নিয়ে পড়ে আমাকে একদিন আগে ফেরত দিয়ে দেয়। মাথা আছে।"

বৌদি অমলা ওদের আদর করে বসালো। বরুণও এল। ততক্ষণে শিবব্রতর গ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ে গেছে অমলাকে আর বনুকে।

বনু বকে চলেছে, "মাষ্টারদের জীবনই এই। এই দে'খনা আমার মাষ্টার। দিয়েছি ভাঙ্গা বোতল দিয়ে এক খোঁচা মেরে। হাত কেটে রক্তারক্তি। সামান্য একটা বোতলের খোঁচায় এত রক্ত বেরোয়,

কি করে ?" বলে সব খুলে বললো ওর বীরত্বের কাহিনী। বরুণ এসে বসলো ওদের মাঝে।

"তারপর বলতো, তোমাদের কে কি ঠিক করলে ক্যারিয়ার সম্বন্ধে।"

"আমি মাষ্টারিই করবো সারাজীবন" শিবব্রত বলে। "পরে এম. এ. পাশ করে অধ্যাপক হব।"

"বেশ ভাল কথা। কিন্তু এখন থেকেই একটা বাঁধা পথে স্থাণু হয়ে না বসে একটু এদিক ওদিক দেখলে ভাল হয় না ?"

"কিন্তু সাধারণ বি. এ. পাশ করে আর কি করতে পারি বলুন। আমি খাটতে রাজী। কিন্তু একমাত্র কোন কারখানার কাজ ছাড়া খেটে করে খাওয়ার পথ আর কি আছে? শিক্ষিত বেকার হয়ে বসে থাকার চেয়ে একটা কিছুতে লেগে থাকাই কি ভাল নয় ?"

"নিশ্চয়ই ভাল," বরুণ বলে, "তবে এমন সরকারী কাজ যদি পাও, যাতে, যাতে ছুটি উপরি পয়সা আসে ?"

শিবুকে যাচাই করে নিতে চায় বরুণ।

"তা দেখুন, আমরা কেউ মুনি ঋষি নই যে ছুটি পয়সা উপরি পেলে ঘেন্নায় হাতে নেবোনা। ওটা বোকামী।"

বরুণের মনে খচ করে একটা খোঁচা লাগলো। আবার মনে পড়লো সেই পাষাণ গলানো রস—একশোটি টাকার কথা। পাষাণ আর আসেনি। অন্ততঃ ওর কাছে নয়। আর আসবেও না মনে হয়। কিন্তু ওর অনুপস্থিতিতে রেখে গেল একটি অধঃপতনের ইতিহাস ওর ড্রয়ারের কাগজের তলায়, করে গেল ওকে একটি ক্ষণিক পদস্খলনের অপমান, এতদিনের বাঁচিয়ে রাখা আদর্শের পদচ্যুতি। এর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে। টাকাটা ফিরিয়ে নিতে পাষাণ আর আসবে না। ঐ টাকা কাউকে দান করে দেবার সামর্থ্যও আর নেই। অমলার হাতে বন্দী হয়ে ঐ টাকা কোথায় হারিয়ে গেছে। শুধু গুমরে মরছে বরুণের তিক্ত মন!

"এবার তোমার কি বলমালী? ওকি, তোমার হাতে ওটা কি লাগিয়েছ—তাবিজ? কি হয় ওতে?"

"ওটা জামাইবাবু ভীষণ জাগ্রত। আপনি তো এসব বিশ্বাস করেন না, বুজরুকী বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এই কবচ বিশেষ শক্তি রাখে। একাদশীর দিন সধবার কাছ থেকে নিতে হয়। কাকীমা দিয়েছেন।"

জিতেন হো হো করে হেসে উঠলো, শিবু বিনয় দেখাতে গিয়ে চুপ করে রইলো। বরুণ রেগে আগুন হয়ে গেল।

"আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। তুমি একজন আধুনিক যুগের ছেলে, কিন্তু তোমার মন কি করে পেলো আদিম প্রস্তর যুগের অন্ধ বিশ্বাস?"

"সেটা দিদিকেই জিজ্ঞেস করুন না। আমরা একটা দৈব শক্তিতে বিশ্বাস করি। রাজুকে কি একটা জালের কাঠি লাগিয়েছে দেখেন নি?"

"দেখেছি। তা ওতে কি হবে ঐ কবচটায়, বললে না তো।"

"ওতে আমার সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি একজন অভিনেতা হতে চাই। হতে চাই সিনেমার জগতের যাকে বলে দিকপাল। কি হবে কতকগুলো বই পড়ে আর পাশ করে; এই কবচের শক্তিতে আমি উঠে যাবো কত উপরে আর নীচে তাকিয়ে দেখবো ছোট্ট একটি পোকাকে—বইয়ের পোকা এই জিতেন্দ্রকে।"

"ভুল বললে বন্ধু" জিতেন জবাব দেয়, "আমি বইয়ের পোকা নই। একবার মাত্র বই পড়ি, চোখ বন্ধ করে খানিক ক্ষণ ভাবি তারপর বই তোমাকে ফিরিয়ে দিই।"

"আচ্ছা জিতেন্দ্র, এবার তোমার কি কল্পনা বল তো। তোমার বাবার কাছে শুনেছি তোমার আশা অনেক উঁচু। তা কি'সে সেই আশার পূর্ণতা পাবে বল তো?" বরুণ জিজ্ঞেস করে।

আমি ঠিক করেছি সৈনিক হব। না, দেশের সেবা করতে একথা বলবোনা। ওটা একটা ভান ছাড়া আর কিছু নয়। আমি চাই

একটা ক্যারিয়ার যাতে গ্ল্যামার আছে, আর একজন মিলিটারী 'কমিশনড্' অফিসারের ইউনিফর্ম্ থেকে বেশী গ্ল্যামার আর কোথায় আছে ?"

"কেন আই এ এস. ?" প্রশ্ন করে বরুণ।

"না, ওতে আমার মন ভরবে না। ওতেই আমার আত্মা স্থাণু হয়ে যাবে। আমি চাই বৈচিত্র্য, জীবনের একটা অস্থির চঞ্চল সার্থকতা। অফিসের চেয়ারে বসে সে'টা হবে না। তাই আমি হতে চাই সোলজার, বানাতে চাই একটা এক্সাইটিং ক্যারিয়ার।"

অধ্যায় ৩

সোনালী আবার এসেছে ছুটির দিনে। বরুণের সঙ্গে চিন্তা বদল করতে ওর ভাল লাগে।

বরুণ বলছিলো—"ভগবানকে কেউ মানে আবার কেউ মানে না। কিন্তু ধর্মের নামে রক্তপাত হয় কেন তবে ? নিজের নিজের আলাদা পথে সংঘাত হয় কি করে ?"

সোনালী জবাব দেয়—"রক্তপাত বোধ হয় প্রকৃতিরই অলঙ্ঘ্য নিয়ম।"

"কিন্তু তাহলে একজন শাকাহারী হয় আর অন্যজন পেট ভরে মাংস খায় কেন ? সবাই তো একই নিয়ম মানে না। প্রকৃতির নিয়মে এক জীবের আর এক জীবকে হত্যা করার অবাধ অধিকার দিন রাত আমাদের চোখে পড়ছে। গোহত্যা তাহলে কি করে পাপ হয়ে গেল ? প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে বিবাদ করে ধর্ম কি করে গড়ে ওঠে আলাদা পথে। আর এই গোহত্যাই তো আর এক ধর্মের পালনীয় আচরণ।"

সোনালীও এসব ব্যাপারে চিন্তা করে।

"দেখুন, আমার মনে হয় এই হানাহানি করাটা মানুষের একটা আচরণ হয়ে গেছে। একটা অজুহাত পেলেই হলো। এই তো দেখুন না ভাষা নিয়ে মারামারি। রেলগাড়ীর গায়ে লেখা একটা ভাষা কারও কারও ভাল লাগে না বলে পুরো গাড়ীটাই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাষা তো মানুষের প্রাণের কথা কিন্তু সেই প্রাণ বিকিয়ে দিয়ে তবে ভাষাকে বাঁচাতে হয়।"

"ঠিক তাই। এই যে যুদ্ধ, মহাযুদ্ধে এতগুলো জীবন বলি হয়ে যায় তাকে তো বলা হয় বীরের মৃত্যু। দেশপ্রেমের নামে জন-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে দিয়ে হাজারো জীবন নিয়ে খেলা করেন রাষ্ট্র-নেতারা, কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়া সমাজ গঠন হয় না এই আলোকিত যুগে। কিন্তু মন যে অন্ধকারেই রয়ে গেল।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সোনালী বলে,

"আমরা সমাজকে বলি মঙ্গলের সমাজ। কিন্তু মাঙ্গলিক গানে করি শক্তির বন্দনা। সমাজের উপকার হবে। কিন্তু জোর করে উপকার করতে গিয়ে শক্তিপ্রয়োগের দাম্ভিকতা দেখাতে হয়। তবে কি সেই সমাজে গলদ আছে ?"

"নিশ্চয়ই আছে," বরুণ জবাব দেয়,

"সমাজে দুর্বলতা না থাকলে তাকে ঢাকতে শক্তির আবরণ দরকার হবে কেন ? রক্তপাত করে, বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে সমাজগঠন হয়, কিন্তু বিবাদ আর সন্দেহ তো শেষ হয়ে যায় না। তাই সমাজে সমাজে রেষারেষি লেগেই আছে।"

"আরও আশ্চর্য্য একটা জাতি সমাজ বলে—এই রেষারেষির মীমাংসায় লক্ষ লোকের জীবন বলি এমন কিছু বড় দাম নয়। অথচ এই দামের কেনা সমাজের সুফল ভোগ করবে তাদেরই পঙ্গু শিশুরা অণুক্ষরণে বিকলাঙ্গ হয়ে।" সোনালী বলে।

অমলা ঘরে এসে ঢুকলো কপট রাগে গজ গজ করতে করতে—

"সেই তখন থেকে দুজনে রাজনীতি ও সমাজ-নীতির হেস্ত নেস্ত করে ফেলছো। আমার জন্যে কি কিছু রাখবে না কি, না আমি শুধু দাসীবৃত্তি করে যাবো ?"

"কি যে বল অমু" বরুণ আশ্বাস দেয় "রাজনীতি আমিও করি না, তুমিও না। আমরা শুধু চিন্তা করি আর সুযোগ পেলে চর্চা করি।"

"আচ্ছা হয়েছে, চিন্তানায়ক, এবার চা খেয়ে চিত্তবিনোদন করুন। চল্ সোনালী ওঘরে চল্।"

চায়ের টেবিলে সবাই গোল হয়ে বসলো।

বরুণ আবার সুরু করলো—

"আচ্ছা, এবার সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে একটা সাধারণ গল্প বলি। এক যে ছিল রাজা।"

"ওমা, তুমি ছেলে-ভোলানো গল্প বলবে নাকি ?" অমলা জিজ্ঞেস করে।

"না, ছেলে ভোলানো নয়, মেয়ে-ভোলানো, দাসী-ভোলানো গল্প," বরুণ উত্তর দেয়, "তারপর, সেই রাজা হলেন গিয়ে মধ্য-এশিয়ার কোন এক ছোট্ট দেশের ছোট্ট রাজা, মরুভূমির মালিক ইমাম। মধ্যযুগীয় বর্বরতা, এক-নায়কতা নিয়ে এই যুগেও শাসন করেন রূঢ় হাতে, দারিদ্র্যের চাপে পঙ্গু এক মূক সমাজকে। সে সমাজে প্রগতির আলো পৌঁছোয়নি। হয়নি মনের বিকাশ শিক্ষার দাক্ষিণ্যে। গরীব, হীনবল, নোংরা এক জনসমষ্টি নীরবে সহ্য করে যায় আল্লাতালার প্রতিনিধি মহামানব ইমামের কর্কশ শাসন আর লুণ্ঠন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে গুমরে ওঠে চাপা আগুন। হাতে পাখা নিয়ে সেই আগুনের পাশে জড় হয় দেশ-বিদেশের কুটনীতিক আর গুপ্তচর। নিজের নিজের দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে করে অসংখ্য ষড়যন্ত্র।

"ইমামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ধরা পড়লো একটি যুবক। ইমাম হুকুম

দিলেন প্রকাশ্যে ফাঁসী হবে রাজদ্রোহীর। রাজপুরুষ মহামান্য ইমামের হয়ে হতভাগ্যকে প্রশ্ন করেন—তার কোন শেষ ইচ্ছা আছে কি না। বিশাল দৈত্যের মত জল্লাদ দুহাতে থুথু মেখে দড়ি ধরে করে আস্ফালন। অভিশপ্ত যুবক আলখাল্লা-সহ দুটি হাত বাড়িয়ে জীবন-ভিক্ষা করে ইমামের কাছে। ইমামের মুখে ফুটে ওঠে ক্রূর হাসি।

"হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে একটা গুলিভরা পিস্তল এসে পড়ে যুবকের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আলখাল্লার উপর। ক্ষিপ্র শিক্ষিত হাতে ও তুলে নেয় পিস্তল, গুলি করে ইমামের বুকে পেটে। থ' হয়ে যায় হাজার দর্শক আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিনাদে ঘোষণা করেন সেনাপতি—অত্যাচারী নীচ রাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। 'ইমামেট' আজ থেকে হবে প্রজাতন্ত্র আর তিনিই হবেন প্রথম রাষ্ট্রপতি।

"এত বড় বিপ্লব আর পরিবর্তন ঘটে গেল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। কিন্তু কত দিন, কত মাসের প্রস্তুতি আর অভ্যাস চলেছিল তার আগে, তা এখনও কেউ জানে না। জানবে যখন এই প্রজাতন্ত্রের আবার পতন হবে, রাষ্ট্রপতি হবেন বন্দী, আর সব পোড়ানো কাগজ উদ্ধার করে লেখা হবে আর এক নতুন অভ্যুত্থানের ইতিহাস।"

এবার অমলা যোগ দেয় আলাপে, "ইতিহাস তো আমিও পড়েছি দেখছি। হত্যা দিয়ে স্থায়ী সমাজ গঠন হয়নি তো কোনকালে। কোথায় গেল রোমানদের উন্নত সমাজ, কোথায় গেল হিটলার, আইখ-ম্যান। ইহুদীহন্তা আইখম্যানকে তো আর্জেন্টিনার অজ্ঞাতবাস থেকে চোরাচালান হয়ে ইজরাইলের আদালতে এসে প্রাণ দিতে হোল ফাঁসিকাঠে।"

বিজলী রাতির আলো নিভে গেল। সুরু হলো লোড্ শেডিং। আজ আর সারা রাত আলো জ্বলবে না। সোনালী উঠে দাঁড়ালো, "যাবার সময় হলো এবার, আঁধার পথেই চলি। চলিরে অমলা।"

"ও বাবা, তুই আবার কবিতা বলছিস যে রে। তা বলে যা-না আর একটু।"

"আচ্ছা তবে তাই হোক" বলে সোনালী বসলো আর গড় গড় বলে যেতে লাগলো নিজের রচনা গদ্যকবিতা।

"চোখ মেলে দেখি আমার দেশের মাটী,
বনরাজির শ্যামলিমা, শস্যের ক্ষেতে বয়ে যায়
সোনালী ঢেউ। পাখা মেলে দূরান্তে উড়ে যায়,
যাত্রার আনন্দে বিহ্বল দূরযাত্রী পাখীদল।
সুদূর সাইবেরিয়ার শীতল রুক্ষতাশেষে
ভারতভূমির চির উষ্ণ আবাহন। ওরা তো
জানে না ভেদের ভূগোল, ওরা জানে শুধু
উদার দান জীবনের পূর্ণতার উপাদান।"

অধ্যায় ৪

অতি ঘন জঙ্গলের গহন আড়ালে অতি উগ্র এক বে-আইনী দলের শিক্ষাশিবির। মানুষমারার শিক্ষা নেয় এখানে অন্য মানুষ, রাজনৈতিক মানুষ। পাইপের নল দিয়ে তৈরী হয় বন্দুক, বিস্ফোরক দিয়ে হয় মানুষমারা বোমা, ছুরি দিয়ে ঘষে ঘষে কি করে একটি অজ্ঞান লোকের গলা কেটে দুখান করতে হয় সে শিক্ষা দেয় জেলফেরত ভাড়া করা গুণ্ডা। তরুণ কচি মনকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দেয় বিপথগামী নেতা। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে তরুণরা আসে এই বনে কিসের টানে? সৈন্যবিভাগ থেকে অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে আসে ডেজারটার 'ভগৌড়া' কিসের লোভে? জঙ্গলের বাইরে গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রাখে পুলিশ আর তাদের সাহায্যে মিলিটারী—কার খোঁজে?

"এ, ভগৌড়া, ইধার শুনিয়ে," ডেজারটারকে ডাক দিলেন নেতা।

"দেখিয়ে জী, মেরা নাম 'ভগৌড়া' নেহি। 'হাওলদারজী' কহিয়ে," রুক্ষভাবে জবাব দেয় ভগৌড়া, "আউর মেরে লিয়ে সরাব আউর ঔরৎ কা বন্দোবস্ত্ নেহি হোগা তো ময় ইহা নেহি রহুংগা। সাফ জবাব।"

"আচ্ছা বাবা, তোমার তো আদর্শ বলে কিছুর বালাই নেই। হাতিয়ারগুলো দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে সরে পড়।"

"বহুৎ আচ্ছা," মঞ্জুর করে ভগৌড়াজী।

দিনের শিক্ষাশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে মহানেতার মুখের জ্বালাময়ী বাণী শোনে বিপথগামী বিপ্লবী তরুণের দল।

"স্বাধীনতার ফলে আমরা কি পেয়েছি বলতে পারো তোমরা? কিছুই পাইনি। কারণ, আমরা পেতে শিখিনি। তাই মহাবিপ্লবের দিন এসে গেছে। বিপ্লব করে আমাদের আদায় করে নিতে হবে জোর করে আমাদের পাওনা, আমাদের প্রার্থিত সমাজ, আমাদের দলের শাসন। সমস্ত প্রতিরোধ বিলীন করতে হবে মারণ অস্ত্র দিয়ে, হত্যা দিয়ে।"

রোজ সন্ধ্যায় একই কথা শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠলো ছেলেদের মন। কার আদেশে, কিসের আকর্ষণে এরা এসে জমেছে এই জঙ্গলে? একটা উত্তেজনা, একটা নতুন রকমের ছন্নছাড়া জীবন, একটা বিপ্লবী জীবনের টানে। এসে জুটেছে অসংখ্য তরুণ, বনমালীও তাদের দলে—বীর বিপ্লবী হওয়ার আশা নিয়ে।

সকালবেলা বনমালী বসে ভাবছে। ভাববার সময়ই বা কতটুকু? সারাদিন এক অস্থির চঞ্চলতার আর শিক্ষণের কর্মব্যস্ততার মাঝে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় নেই এখানে। সময় পেলেই একটা অস্থির চিন্তা ঘিরে আসে মনে—কোথায় চলেছি আমি? কোথায় আমার মনের তৃপ্তি? আমার নিজের মন বলে কি কিছু আছে? নেই কেন? কারণ, দেহের উত্তেজনায় আমি মনের খেই হারিয়ে ফেলেছি। এই ই তো ভাল লাগে আমার। লাগে কি?

আর ভাববার সময় হলো না। হুইসিল বেজে গেছে। ছুটে যেতে হবে শিবিরের ধারে। দড়ি বেয়ে গাছে ওঠা, সাঁতার শেখা, ছোরা চালানো শিখতে হবে। সবচেয়ে অবশ্য ভাল লাগে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে, আর পিস্তল। এত ক্ষমতা হাতে ধরা এই ছোট্ট যন্ত্রের দৌলতে!

* * * *

বিপ্লবী বনমালী আর সৈনিক জিতেন্দ্র একই জঙ্গলের ভিতরে আর বাইরে। বনমালী আজ নেতা হয়েছে, আর জিতেন হয়েছে ক্যাপটেন, পুলিশের সাহায্য করতে মিলিটারী দলেব কমাণ্ডার।

* * * *

ধরা পড়েছে বনমালী পুলিশের হাতে। জাল দেওয়া কালো গাড়ীর ভিতরে বনমালী, বাইরে জিতেন। দুই বন্ধু আজ লোহার জানালার দুই ধারে মুখোমুখী। একই পৃথিবীর দুই ধারের মানুষ দুই আলাদা জীবনের মানুষ।

গম্ভীর নীরবতায় কথা আজ হয়নি দুজনের। নিজের বেছে নেওয়া জীবনের খুঁজে নেওয়া তৃপ্তি আর সার্থকতার তুষ্টিতে মন ভরা দুজনেরই। আজ আর কথা নেই। সব কথা বলা হয়ে গেছে অনেক আগে, ছাত্রজীবনে। আজ দুজনের পথ আলাদা।

* * * *

ভোটযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। গড়ের মাঠ মিলিটারী তাঁবুতে ছেয়ে গেছে। কাতারে কাতারে পুলিশ বুথ-এ ছড়িয়ে গেছে। তাদের সাহায্য করতে দলে দলে প্রস্তুত হয়ে আছে সশস্ত্র সৈনিক—ক্যাম্পে ক্যাম্পে। সারা প্রদেশে একটা অস্থিরতা, চাপা উত্তেজনা।

জিতেন সৈনিক, একটা বড় দলের ছোট্ট অধিনায়ক। সৈনিকের রাজনীতি নেই। আছে শুধু সঠিক কর্তব্যজ্ঞান। শৃঙ্খলারক্ষায় পুলিশের সাহায্যদান। সীমান্তে শান্তির অবকাশে অন্তর্দেশে কর্তব্যের আহ্বান।

সৈনিকের ভাবনা নেই—কে কাকে শাসন করলো। [illegible] কোন্ দল কোন্ নীতির ভিত্তিতে কোন্ কৌশলের [illegible] জনতাকে ভোলালো—তা নিয়ে চিন্তা করার অধিকার [illegible]। আইন-গঠিত সরকারের আদেশ পালন করে শুধু নিজের ব[illegible] যাওয়া সৈনিকের ব্রত।

* * * *

নির্দলীয় প্রার্থী বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন—

"দলের বিরোধ, নীতির আর রাজনীতির বিরোধের সমাধান অতি সহজেই হয়ে যেতে পারে যদি কোন দলই না থাকে। সব রাজনৈতিক দল মিলে হয়ে যাক একই দল। অর্থাৎ কোন দলই থাকবে না। সব দলাদলির হবে শেষ। শাসন হবে জনকল্যাণের শাসন, অত্যাচারের শাসন নয়। তাই, শাসনের সরকার যদি সব দল নিয়েই হয় বা নির্দলীয় হয়, অথবা সবচেয়ে ভাল পথ যদি একেবারেই দলনিরেপেক্ষ হয় তবেই কি ভাল হয় না?

"আমরা শাসনতন্ত্র মেনে নিয়েছি জনতার ভোটের ভিত্তিতে। অটুট থাক সেই ভিত্তি। কিন্তু মনোনয়ন করতে হবে কোন দলের প্রার্থীকে নয়। প্রার্থীর জনকল্যণের ভিত্তিতে। কারণ কোন দলই থাকবে না। দলের নীতি সাধারণ মানুষ আর কতটা বোঝে? জনতাকে ভোলানোর কূটবুদ্ধি তো কোন দলেরই অজানা নয়। তবে কেন আর এ বঞ্চনা? জনতা নির্বাচন করবে তাঁকেই যিনি মহান ত্যাগের ব্রত নিয়েছেন, যিনি লোককল্যাণে নিজের কল্যাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আসুন, শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে সংশোধন করে নিই যাতে শাসক আর শোষণের নিন্দা মাথায় নিয়ে গঞ্জনা শুনবে না। নিন্দুকেরা উদগ্র হয়ে অপেক্ষা করবে না পরবর্তী নির্বাচনের, যখন আবার আসবে পরাজিতের সুযোগ ছলে আর কৌশলে ভোটযুদ্ধ জিতে নেওয়ার।

"যুদ্ধ করতে গেলে কোন নীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই।

[illegible] করে শুধু নির্বাচনই করা যাক না জনতার মতের [illegible] তাই জানবে—কে তাদের 'শাসন' না করে মঙ্গল [illegible]”

*　　　*　　　*　　　*

[illegible] দলের মিটিং। সুরু হতে দেরী নেই। কাতারে [illegible] আছে মাটিতে। মঞ্চের উপর প্রধান বক্তা আসন [illegible] সংখ্য ফুলের মালা বিনয়ের সঙ্গে নামিয়ে রাখলেন [illegible] একটু দূরে পুলিশদল, শান্তিরক্ষার প্রহরী, অশান্তি দমনের সজাগ সান্নিধ্যে ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে লাইন করে। আর একটু দূরে নির্বিঘ্ন দূরত্বে সশস্ত্র পুলিশের ছোট্ট একটি দল। একটা থম্‌থমে ভাব চারদিকে।

বক্তৃতা সুরু হলো। মঞ্চের এক কোণায় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো। পকেটের ছোট্ট কৌটো থেকে পেট্রল ঢেলে দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে ছুটে পালালো একটি যুবক। পিছনে ছুটলো পাঁচ-ছ'জন লোক ধর্‌ ধর্‌ বলে ওকে ধরতে। বক্তা নির্বিকারভাবে বলে চলেছেন তাঁর দলের নীতি।

হঠাৎ সুরু হলো ইট-পাথরের বৃষ্টি। আগুন লাগিয়ে পালানো ছেলেটাকে মাটিতে চেপে ধরলো ধাওয়া-করা লোকেরা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝখানে বোমা এসে পড়লো - বুম বুম। ধোঁওয়া, ছুটোছুটি আর চীৎকারের মধ্যে সভা হয়ে গেল পণ্ড। বক্তৃতা থেমে গেছে। পুলিশ কাছে এসে গেছে। ওদের হাওলদার নাকে ইঁট লেগে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে, রক্তে ভিজে গেল ইউনিফর্ম। লাঠি হাতে তাড়া করলো অন্য পুলিশ। দুমদাম পিঠে লাঠি পড়তে লাগলো, ভয়ে পালালো লোকগুলো। আরো বোমা, আরো চীৎকার, আরো গুলির আওয়াজ। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁওয়ায় চোখে জল, ইটের ঘায়ে গায়ে রক্ত, বোমার ঘায়ে ঝুলে-পড়া হাত নিয়ে ছড়িয়ে রইলো মাঠের মাঝখানে একদল মানুষ। তাদের উপর

দিয়ে মাড়িয়ে পালিয়ে গেল আর এক দল। সব [illegible] শেষ।

* * * *

লালবাজার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার। পুলিশ ও মিলিটারী 'জয়েন্ট কন্ট্রোল রুমে' ডিউটি অফিসার জিতেন। [illegible] দিকে কলামগুলো টহল দিচ্ছে খোলা গাড়ীতে। [illegible] দুজন শান্ত্রী, প্রহরী হাতের রাইফেলে একটি করে গুলি ভরা। ইমার্জেন্সীতে ওই একটা গুলি মারতে হুকুমের দরকার নেই। দলের কমাণ্ডার কলামের সবচেয়ে আগে, সঙ্গে আছেন সিভিল ম্যাজিষ্ট্রেট। ফায়ারিং দরকার হলে লিখিত আদেশ দিতে হবে।

নানা রংএর বোতাম ম্যাপের উপর সরিয়ে সরিয়ে জিতেন কলাম-গুলোর গতিবিধির হদিস রাখছে আর মাঝে মাঝে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট দিচ্ছে। রেডিওর কন্ট্রোল সেট্-এ ওর কাছে একনাগাড়ে রিপোর্ট আসছে কলামগুলোর কমাণ্ডারদের কাছ থেকে। সীমান্ত থেকে এসে 'এইড্-টু-সিভিল পাওয়ারে'র কাজ বেশ নতুন রকম লাগছে।

শহরের একটা ঘিঞ্জি এলাকা দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে কলাম। শান্ত্রীদের চোখ সজাগ—উপরে, নীচে, সামনে, পিছনে। হঠাৎ একটা খোলা গাড়ীতে এসে পড়লো একটা ছোট্ট বোমা। ফেটে গিয়ে ধোঁওয়ায় ঢেকে গেল বড় মিলিটারী খোলা গাড়ী। উপরে তাকাতেই নজরে পড়লো, ছাতের উপর থেকে সরে যাচ্ছে দুটি যুবক। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রীর হাতের রাইফেল গর্জে উঠলো, একটা গুলি ফায়ার হয়ে গেল। ছেলে দুটো পালিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরে। 'ওয়ারলেস'এ খবর পেয়ে পুলিশ এসে গেল। ততক্ষণে মিলিটারী কলাম বাড়ীটাকে ঘিরে আগলে নিয়েছে। পুলিশ এসে ভিতরে ঢুকে বার করে আনলো ছেলে দুটিকে। মিলিটারী কলাম আবার ঘর ঘর শব্দে সুরু করলো মন্থর টহল। প্রত্যেক গাড়ীতে দুজন সশস্ত্র প্রহরী।

* * * *

নক কষ্টে বিশেষ অনুমতি পেয়েছে বরুণ, বনমালীর সঙ্গে [illegible] জেলে দেখা করতে। অমলাও এসেছে। অমলা কাকাবাবুকে [illegible] য়েছিল। বলেছিল, "বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি [illegible], আপনি যাবেন ?"

[illegible] !?" প্রশ্ন করেন কাকাবাবু।

আমাদের বনমালী যে। এখানেই তো থেকে গেল কতদিন।"

"ও! বনবাসী? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তা বনচারী তো ছিল এখানেই বেশ ক'দিন আগে। দেখা হয়নি বুঝি ?"

"না, আমরা জেলে যাচ্ছি ওর সঙ্গে দেখা করতে। আপনি যাবেন ?"

"আমি জেলে যাবো ? কেন বলতো ?"

"বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।"

"কে বন্ধু ?" কাকাবাবু জিজ্ঞেসা করেন। নামটা যেন চেনা চেনা মনে হয়।

"ও কাকাবাবু! আমাদের বনমালী…বন্ধু জেলে আছে যে। তার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন আপনি ?"

"ও! বনমালী? আচ্ছা দেখে এসো, ভালই আছে মনে হয়। তবে খুব ছুটোছুটি করে সব সময়। হ্যাঁরে, জেলে কি খেতে দেয়, না শুধু শুধু খাটিয়েই মারে ? আমাদের ছোটবেলায় জেলের উপর একটা ভীতি ছিল ভীষণ, চিমনী দিয়ে ধোঁওয়া বেরোতো দেখে ভাবতাম চোরগুলোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে। কি ভয়ানক! কিন্তু বনবিলাসী জেলে গেছে কেন ? কি করেছিল সে হ্যাঁরে ?"

"সে পরে একদিন বলবো। এখন আপনি যাবেন কি-না বলুন। না হয় আমরা চলে যাই।"

"সে কি ভাল হবে, এই জেলে যাওয়াটা ? তোমরা তো চুরি-ডাকাতি করোনি !"

* * * *

গরাদ-দেওয়া জানালার ধারে বসে আছে বরুণ আর
পুলিশ অফিসার খবর দিলেন বনমালী কারও সঙ্গে দেখা কর
না, আসবে না।

শেষ পর্যন্ত 'ভিজিটিং আওয়ার' শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে
বনমালী।

বরুণ জিজ্ঞেসা করলো—

"কার উপর তোমার রাগ বলতো বনু?"

"রাগ আমার কারও ওপর নেই। কেন আপনারা এসেছেন এখানে? আমি চাই না আপনাদের সমাজ আমাকে পিছু টানুক। আমি আপনাদের সমাজের বাইরের লোক। আমি কারও ভালবাসা চাইনে," ঘাড় হেঁট করে গোঁজ হয়ে বসে রইলো বনমালী।

এবার অমলা একটু কাছে এসে বললো, "আচ্ছা বনু, তুই আমাদের ছেড়ে দিতে পারিস্। কিন্তু আমরা তোকে ভুলবো কি করে! তুই যে আমার মায়ের পেটের ভাই। তোর আবার বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না? সাধ হয় না সকলের মত সাধারণ জীবন যাপন করার?"

"না, আমি সাধারণ হতে চাই না। আমি অসাধারণ, অসাধু হয়েই থাকবো। তোমাদের সমাজ যাকে সাধুতা বলে তাতে আমার লোভ নেই। আমার জীবনপথ আলাদা।"

"তবে কি তুই জেলে জেলেই থাকবি সারাজীবন? আমরা তোকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবো না?"

"কিছু দরকার নেই। আমি বেশ আছি। তোমাদের জগতে তোমরা থাকো। আমি আমার কর্তব্য, আমার জগৎ নিয়ে আমার পথে সারাজীবন কাটিয়ে দেবো। আমার পথ অনেক আলাদা।"

বরুণ ওকে মনে করিয়ে দেয় আশার কথা, "কিন্তু তোমার যে সাধ ছিল অভিনেতা হয়ে বড় হওয়ার? সমাজের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াবার?"

ই." সোজা জবাব দেয় বনমালী, "ওই সমাজে বড় হওয়ার . । আমরা একটা নতুন সমাজ গড়বো, যেখানে ধনীর শোষণ, উঁচু স্তরের নকল ঐশ্বর্য আর নীচু স্তরের মানুষের অবিরাম হা-হুতাশ আর থাকবে না। সব মানুষ সমান হয়ে যাবে, সবাই খেটে খাবে। সমাজে অসাম্য অসমতার দাবী নিয়ে আর কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। সেই মাথা আমরা নামিয়ে দেবো, লুটিয়ে দেবো।"

"এই বুঝি তোমাদের বিপ্লবের পথ ? সব উঁচুকে নীচু করে দিয়ে, সমান করে দিয়ে তোমরা উপরে ওঠার সব পথই বন্ধ করে দেবে নাকি ? কোন প্রতিভার বিকাশ হবে কি করে তাকে স্বীকৃতি না দিলে ?"

"প্রতিভার দাবী করবে তারাই যারা আমাদের নতুন সমাজে নতুন পথ দেখাবে জনতার উন্নতির মাধ্যমে, মুষ্টিমেয় ক'জন শক্তি-ধরের ধনরাশির মাধ্যমে নয়।"

"আচ্ছা হয়েছে বনু" দিদি বলে, "আরতো সময় নেই আজ। তুই আমাদের ভুলে যাস্‌নে ভাইটি আমার, আমবা আবার আসবো।"

"না, আসিস্‌ নে। তোরা আমাকে ভুলে যা," শুকনো হাসি হেসে বললো বনু, "আমার মন শুকিয়ে গেছে দিদি। তোদের উপর আমার মনের পিছনে একটু যাও জায়গা ছিল, এখন আর নেই। আমি কিছুই চাই না তোদের কাছে।"

ওদের দিকে আর ফিরে না তাকিয়ে বনু চলে গেল ভিতরে। পিছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

* * * *

জিতেন ছুটিতে এসেছে গ্রামের বাড়ীতে। বছরে দু'মাস পুরো মাইনের ছুটি। এসেই দেখা করতে এসেছে বরুণদার সঙ্গে।

বরুণ ওকে দেখে খুশী হলো খুবই। জিজ্ঞেসা করলো, "আচ্ছা জিতেন, তুমি একটা খুবই নতুন রকমের জীবন বেছে নিয়েছ। কিন্তু যে ইউনিফর্মের গ্ল্যামার দেখে তুমি ভুলেছিলে, সেটা প'রে এলে না কেন ? ওতে তোমার গর্ব নেই ?"

"খুব বেশীই আছে, বরুণদা, কিন্তু আমাদের দেশে এর ম বোঝে না। প্রথমবার ছুটিতে এসে সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্ট-এর ই ... পরে খুব গর্ব করে গিয়েছিলাম গ্রামের পোষ্টমাষ্টারবাবুর বা... ভদ্রলোকের ছ'টি ছেলেমেয়ে বাইরে খেলছিল। আমাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে ভেতরে পালিয়ে গেল

"পোষ্টমাষ্টার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'পুলিশের মত এসব প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন হে?' আমি তার পর থেকে কাজের বাইরে ইউনিফর্ম পরি না—কি লাভ?"

"ঠিকই বলেছ, আমরা দূর থেকে কিছুই জানি না, বুঝিও না। জানার বোঝার আগ্রহও নেই মনে হয়।"

"আমিও তাই দেখছি, আমাকে যেন একটা করুণার চোখে দেখে সবাই। জীবনে আর কিছু করতে পারলো না বলেই যেন ছেলেটা প্রাণ খোয়াতে মিলিটারীতে গেল, এই ভাব ওদের।"

"অথচ ওরা বোঝে না," বরুণ স্বীকার করে, "একজন সোল্‌জার অফিসার হিসেবে তোমার কত উঁচু পদ, স্ট্যাটাস। আচ্ছা একটা কথা ভাবতে আমারও অবাক লাগে। এই যে উপরওয়ালার হুকুম মানতে গিয়ে সৈনিক নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেয়, এ ম্যাজিকটা তোমরা কি করে ঘটাও? প্রাণের ভয় নেই?"

"দেখুন, প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের ভয় আছে। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে। কিন্তু শত্রুর কাছে পৌঁছে গেলে তখন আর প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাকার প্রশ্নই আসে না। ওকথা মনেই হয় না। তখন একমাত্র চিন্তা থাকে নিজের প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায় শত্রুকে মারা। তা নইলে শত্রুর হাতেই যাবে প্রাণ। শত্রুদমনের এই উত্তেজনায় নিজের আত্মরক্ষার ব্যাপারটা একটা স্বয়ংক্রিয় অভ্যাসের মত কাজ করে। হয় শত্রুকে মারো, না হয় শত্রু তোমাকে মারবে। তা ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। আমাদের আইন খুবই কঠিন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরুতা দেখানো এই আইনে সবচেয়ে

রাধ। এর জন্যে কোর্ট মার্শাল হয়ে চরম দণ্ডও হতে পারে—তবে ঐ যা বললাম, আইন, বিচার এসব কথা তখন মনেই ।।”

“এবার বুঝতে পারলাম। কিছু যখন যুদ্ধ নেই তখন তোমরা বসে বসে কি কর? মাঝে মাঝে অবশ্য ‘এইড টু সিভিল পাওয়ারে’ দেখি তোমাদের। কিন্তু অন্য সময়?”

বরুণকে বুঝিয়ে দেয় জিতেন,—

“যুদ্ধেই আমাদের আসল সার্থকতা। কিন্তু শান্তির সময়ে আমরা বসে থাকলে যুদ্ধ করবো কি করে? তাই শান্তির সময় আমরা করে যাই একনাগাড়ে শিক্ষা, অভ্যাস ও প্রস্তুতি। কষ্ট কিন্তু ওতেই বেশী। যুদ্ধক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে এক এক ক্ষেত্রে নীরব অকর্মণ্যতা থাকে। কিন্তু শান্তির সময় তা নেই। চরম দিনের প্রস্তুতিতে দেহের সব আরাম বিসর্জন দিয়ে আমরা করে যাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। নকল শত্রুর সৃষ্টি করে তাকে মেরে বা তার হাতে মার খেয়ে আমরা করি নকল যুদ্ধের অভ্যাস, আসল যুদ্ধের প্রস্তুতিতে।”

“এর জন্যে কোন দুর্ঘটনা হয় না তোমাদের?”

“নিশ্চয়ই হয়,” জবাব দেয় জিতেন, “প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শিক্ষা নিতে প্রাণ দিতে হয় বৈকি। সেটাকে কর্তব্যে জীবনদান বলে ধরে নিয়ে মৃতের পরিবারের প্রতি কর্তব্য ঠিকই করা হয়।”

“আচ্ছা এবার বলতো, মিলিটারী জীবনে তুমি সবচেয়ে বড় কি পেলে? টাকা?”

“না বরুণদা, টাকা মোটেই নেই। আমরা অফিসাররা মোটা মাইনে পাই ঠিকই। কিন্তু একটা ডিসেন্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড রাখতে গিয়ে হাতে আমাদের বিশেষ বাঁচে না কিছুই। অথচ এ না করে উপায়ও নেই। ইচ্ছে করলেই যে কোনভাবে খেয়ে বাঁচতে আমরা পারি না। একটা ঠাট বজায় না রাখলে চলে না। আর এতেই পুরো মাইনে চলে যায় আমাদের।”

"তা হলে পেলে কি, এক মানসম্মান ছাড়া।"

"সবচেয়ে বড় জিনিস যা পেয়েছি সেটা হলো একটা মনের আত্মনির্ভরতা, 'কন্‌ফিডেন্স'। কোন অবস্থায়ই রাস্তার মোড়ে ইতস্তত করা আমাদের অভ্যাস নয়। কোন কাজই অসম্ভব বলে মনে হয় না আমাদের, কারণ আমরা কাজ করতে জানি আর অন্যদের দিয়ে করিয়ে নিতেও জানি। একটা সঠিক কর্তব্যজ্ঞান আর দৃঢ় নিখুঁত চরিত্রই সৈনিক জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ, যদিও দৈহিক সহনশীলতাও সৈনিক জীবনের একটা মূলমন্ত্র। আমার মনে হয়, একজন বাঙালী ছেলের দেহের, মনের, চরিত্রের বিকাশ করতে এই রকম একটা জীবনই সবচেয়ে ভাল। এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে সৈনিক জীবনে এসে।"

* * * *

বনমালী জেল থেকে পালিয়েছে। কি করে, কার সাহায্যে, কোথা দিয়ে পালানো সম্ভব হলো তিনজন বিচারাধীন বন্দীর, তার অনুসন্ধান সুরু হয়ে গেছে। চাবি-ঘরের হাবিলদার মাথায় রডের আঘাতে হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তিন দিন পরে এখনও জ্ঞান হয়নি। দুটো রাইফেল গুম, দুটো তালা ভাঙ্গা, দু'জন ওয়ার্ডার নিখোঁজ। নিপুণ নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করে বিদ্যুদ্‌বেগে কাজ শেষ করেছে দেয়ালের বাইরের তরুণ কর্মীরা।

* * * *

"কি রে দিদি চিনতে পারছিস্?" সন্ধ্যেবেলা লম্বা চুল, মোটা জুলফি ও কালো দাড়িওয়ালা একটি ছেলে দরজা ঠেলে বাড়ীতে ঢুকে গেল।

অমলা ভয় পেয়ে গেল। ও জানতো বনু পালিয়েছে।

"তুই কেন এসেছিস্ বনু?"

"কেন, তোর ভয় করছে? তোদের নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে? তা করবে না। আমার এই ছদ্মবেশ নিখুঁত কিনা বল্।"

, হ্যাঁ, তাই। তুই এবার যা বন্ধু। তোর জামাইবাবুকে
' তো। হয়তো পুলিশ ডেকে তোকেই ধরিয়ে দেবে।"

.' লেই হলো ? যাক গে, আমি গল্প করতে আসিনি। এসেছিলাম শুধু আমার পোশাকের পরীক্ষা করতে। এটা তুই রেখে দে" --বলে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট অমলার হাতে তুলে দিল বন্ধু। রুমাল দিয়ে বাঁধা প্যাকেটটা।

"কি আছে এতে ?" প্রশ্ন করে অমলা।

"আছে কিছু টাকা। জামাইবাবুকে বলিস্ নে যেন। আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি কি না। ওখানে তো এর দরকার নেই। ওরাই সব দেবে। শুধু পথ-খরচটা রেখেছি।"

"কিন্তু," অমলা ভাবিত হয়ে পড়ে, "পুলিশ যদি আমাদের ধরে ?"

"তোদের ধরবে কেন ? ওরা তো টাকা খুঁজছে না। খুঁজছে আমাকে। আমাকে না পেলে অন্যখানে খুঁজতে যাবে।"

"কিন্তু তুই যাচ্ছিস্ কোথায় ? কোন বিদেশে ?"

"তা কি বলা যায় দিদি ? দেশ থেকে বাইরে আর এক দেশে যাচ্ছি। ফিরবো অনেক দিন পরে অনেক কিছু নিয়ে। টাকাটা যদি তোর কাজে না লাগে তবে লুকিয়ে রেখে দিস্। আমি ফিরে এসে নেবো। তবে মামু রাজুকে একটা ভাল কিছু জিনিস কিনে দিস্। আমি চলি," বলে আবার ফিরে গেল আধ-অন্ধকার পথ দিয়ে বনমালী।

একটু পরেই বাড়ীতে এসে ঢুকলো বরুণ। সঙ্গে দু'জন পুলিশ, একজন ইউনিফর্ম-পরা অফিসার আর অন্য জন শাদা পোশাকে ডিটেকটিভ।

বরুণের বাড়ীতে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না। তাই অফিসার দু'জন এসে হাজির হলেন বন্ধুর কাকার বাড়ীতে। বরুণই নিয়ে এল।

বরুণ পরিচয় করিয়ে দিল, "এঁরা দু'জন পুলিশ অফিসার, বন্ধুর খোঁজ নিতে এসেছেন।"

"বন্ধু কে ?" কাকা জানতে চান।

"আমাদের বন্ধু, বনমালী।"

"বনমালী বলে কেউ তো এখানে নেই—"

কাকা ওদের জানিয়ে দেন, "আপনারা ভুল করে এসে পড়েছেন এখানে। তা এলেন যখন, একটু বাড়ীতে তৈরী ঘোল খেয়ে যান। ওরে ও প্রতিমা, এঁদের জন্যে তিন গ্লাস ঘোল নিয়ে আয় তো মা। আমার মেয়ে প্রতিমা, ঐ একটিই মেয়ে। খুব কাজের মেয়ে বুঝেছেন কিনা। তা আপনাদের দাবী-দাওয়া কী ? দেখলেন তো মেয়েকে, মূর্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমা! তাই ওর নাম দিয়েছি প্রতিমা।"

বরুণ পুলিশ অফিসারদের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কাকার ব্যাপারটা। তারপর বললো, "কাকাবাবু, ওঁরা কিন্তু এখনই পাত্রী খুঁজছেন না। খুঁজছেন বনমালীকে।"

কাকা সে কথা কানেই তুললেন না।—"পাত্রটি কি করে ?" প্রশ্ন করেন।

"ওঁরা খুঁজছেন বনমালীকে, পাত্রকে নয়। ওঁরা ধরে জেলে রেখেছিলেন বিচারের জন্যে। সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।"

"বেশ করেছে, বুদ্ধিমানের কাজ করেছে পালিয়ে গেছে, পুলিশের হাত থেকে। তা, কে পালিয়ে গেল ?"

"বনমালী," জবাব দেয় বরুণ।

"কোথায় গেল ?" কাকা প্রশ্ন করেন।

"সেটাই তো জানতে এসেছি আমরা।"

"ও তো জেলেই আছে বললেন।"

"জেলে আর নেই," ডিটেকটিভ মুচকি হেসে জবাব দেন, "আজ আমরা উঠি। চলুন বরুণবাবু। আচ্ছা নমস্কার।"

"আবার আসবেন পাত্রটিকে নিয়ে," নিমন্ত্রণ করলেন কাকা হরশঙ্করবাবু।

*   *   *   *

আকাশ কালো, ঘন মেঘ, কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যায় পাতা ওয়ে, ধূলোর বন্যা বইয়ে। লম্বা কালো চুল খুলে দিয়ে বারান্দায় শুয়ে থাকে প্রতিমা। আধা-শহরের কোঠাবাড়ীতে প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ স্পর্শ, ক্ষণিকের এই গায়ে হাতবুলানো আদর পুরোপুরি উপভোগ করে নবযৌবনা প্রতিমা। ওর মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগে পাড়াগাঁয়ে আশ্রমের মত বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যায় পাখীর কলরব, পুকুরে সাঁতার কেটে স্নান, রাত্রে একলা বারান্দায় বসে গান। ওর শাদা সোনালী গায়ের রঙে কমনীয় কান্তি। দেহের প্রতিটি পেশীতে অনুরণিত হয় এক নব উন্মেষের সুর। মন কেন আনচান করে ওর? মনে কেন নতুন প্রশ্ন জাগে? জিতেনকে ওর ভাল লাগে।

জিতেন এসেছে পর পর ক'দিন। তারপর আর আসে না। ও নিজে যেমন সাধারণ থেকে এক অসাধারণ সমাজের অংশ হয়েছে, তেমনি এমনি একটি জীবনসঙ্গী করে তুলে নেবে ও প্রকৃতির কোলে লালিতা এই তরুণীকে, প্রতিমাকে। দাদাকে বলে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে প্রতিমার বাবার কাছে। তাই আর আসে না। সমস্যা হয়েছিল ওর কর্মজীবনের সামাজিক পরিবেশের উগ্র আধুনিকতা আর নিজের বাড়ীর নম্র শালীনতা আর গ্রামীন মন্থরতার মাঝখানে এক ভারসাম্য। এই সাম্য খুজে পেল জিতেন এই মেয়েটির মাঝে। যে কোন সমাজে অতি সহজে মানিয়ে চলার ক্ষমতা নিয়ে এই অতি বুদ্ধিমতী মেয়েটিই ওর যোগ্যা পাত্রী। তাই একেই করে নেবে নিজের অভিনব জীবনের সঙ্গিনী।

হরশঙ্করবাবু তো শুনে অবাক! এরা বলে কি? মিলিটারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে?

"কিন্তু আপনি তো দেখেছেন জিতেনকে," ওর দাদা বলেন।

"না না, জিতেন আবার কে? আপনি বলছেন পাত্রটি মিলিটারী, তার কথাই বলুন না। ও পাত্র একেবারেই টেকসই হবে না। শেষকালে আমার প্রতিমা কি বিধবা হয়ে জীবন কাটাবে?"

"এ আপনি কি বলছেন?" জিতেনের দাদা উত্তর "জিতেন এখানে অনেকবার এসেছে, আপনার সঙ্গে গল্প করে... মনে পড়ছে না?"

"ও জিতেন! তাই বলুন। কিন্তু আপনি আবার কি যেন বলছিলেন? পাত্রটি কে? মিলিটারী বললেন যে?"

"জিতেনই পাত্র। মিলিটারী অফিসার।"

"তাই বলুন। তবে আর ওসব মিলিটারী না কি বলছেন কেন? হ্যাঁ জিতেন তো চমৎকার ছেলে। আমার খুব ভাল লাগে ওকে। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই হতে পারে বিয়ে। প্রতিমা সুখে থাকবে। কিন্তু মিলিটারীর সঙ্গে কখনও নয়। ওকে আপনি বলে দেবেন ও যেন বিয়েটিয়ে না করে। একটা মেয়ের সর্বনাশ হবে—বিধবা হয়ে।"

"কিন্তু জিতেনই তো মিলিটারী।"

"ও তাই নাকি? তবে এতক্ষণ ভল বলছিলেন কেন? জিতেন? মিলিটারী? তা হলেই বা, ও তো চমৎকার ছেলে। ওকে দেখলে তো ভয় হয় না। তা ছাড়া ও দেখতে তো চালাক চতুর। মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তো! তা হলেই হলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, লাগিয়ে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ........"

তারপর এক জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায় আলো আর গানের সমারোহে, পূজা আর আচারের মাধ্যমে তরুণী প্রতিমা হয়ে এলো বিবাহিতা নারী। রমণীজীবনের সার্থকতা লাভ হলো এক পুরুষের অন্তরঙ্গ আবাহনে, নরনারীর যৌন মিলনে। আজ আর প্রতিমাকে দেখলে চেনা যায় না। সুডোল মুখে এক তৃপ্তির লাবণ্য, সিঁথিতে উজ্জ্বল লাল সিঁদুর, গায়ে হাতে অজস্র অলঙ্কার। জিতেন তো বলছে, "খুলে তুলে রাখো ওসব গয়না। কি হবে গয়না পরে?" ও জানেই না কত ভরি সোনা বা কি কি গয়না দেওয়া হয়েছে ওকে। ও তো গয়না চায়নি। যা চেয়েছে তা পেয়েছে, পেয়েছে একটি সরল মনের অগাধ ভালবাসা, নৈকট্য

· ব সাবলীল আত্মদান। এই প্রাপ্তির, এই অধিগ্রহণের মোহেই আ।চ্ছন্ন হয়ে রইলো ওর মন।

*　　*　　*　　*

বাড়ীতে ঢুকেই প্রতিমা কান্নায় ভেঙে পড়লো। শ্বশুরবাড়ী থেকে আসছিল বাসে করে, মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। সঙ্গে স্যুটকেসে ছিল বিয়ের সব ভাল ভাল শাড়ী, গরম কাপড়, গয়না। ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে বাসের সামনের জায়গা থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে পালিয়েছে চোর। কে চোর?

ফিরতি পথে বাসের ড্রাইভার ও কণ্ডাকটারকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। থানায় ওরা হলপ করে বললো ওরা কিছুই জানে না!

"যার মাল, সেই তো নিয়ে গেল বলে জানি বাবু সাহেব।"

"বটে? কে নিয়েছে বল, কোন্ চোর?"

"কোন্ চোর সেটা কি আমরা জানি বাবু? সে তো আপনারাই ভাল জানেন।"

"আচ্ছা, চোর ধরা না পড়লে কিন্তু তোমাদের কপালে দুঃখ আছে বলে দিচ্ছি।"

"আর ধরা পড়লে কার দুঃখ দূর হবে বাবুজী?" প্রশ্ন করে বেয়াড়া বুড়ো ড্রাইভার।

*　　*　　*　　*

প্রতিমার কান্না আর থামে না। হরশঙ্করবাবু তো বুঝিয়ে শান্ত করেছেন ওর মাকে, কিন্তু মেয়ের দুঃখ তো যায় না।

জিতেন এসে বললো, "ভালোই হলো, আপদ চুকলো। এবার আমি নিজেই করে দেবো তোমার যা যা দরকার। তবে গয়না আর দরকার নেই, কি বল?"

"না দরকার নেই," আবার কেঁদে বলে প্রতিমা, "গয়না ছাড়া মেয়েদের আছে কি?"

"ঐ তো, ওটা তোমাদের আর একটা সংস্কার," বোঝায় জিতেন,

"আমার সঙ্গে যখন আমাদের নতুন সমাজে যাবে ... ...
গয়নার উপর কোন লোভ তোমার থাকবে না। আর ...
নতুন জিনিস জীবনে খুঁজে পাবে যেখানে গয়নার স্থানই ...

"তা হলে চোরবা আমাদের লুটে বড়লোক হয়ে যাবে

"হয়েছে নাকি," হেসে প্রশ্ন করে জিতেন, "কই, এমন ... ...
তো চোখে পড়ছে না যার জীবনের মান বেড়ে গেছে ...
চুরির পর। যে তিমিরে সে ছিল সেখানেই থাকবে। কিন্তু ...
আমরাও যে স্তরে আছি সেখানেই থাকবো মাঝখান থেকে ...
ঠুনকো সম্পদ হাতবদল হয়ে গেল আর কি। দেশের অর্থনীতি
কিছু বদলে গেল না এতে।"

"যাও, তোমার সব কিছুতেই ঠাট্টা। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে
জেগে উঠেই কেমন যেন বুকটা খালি খালি মনে হয়। কি যেন ছিল
হারিয়ে গেল।"

"মনে হয় নাকি?" জিতেন বলে ওঠে, "তা ক'দিন পরে
আর হবে না। পাশে আমি ছিলাম না তো, তাই ও রকম মনে
হয়েছে। আর দুএক বছর পরে তো তোমার কোল আরও ভরে
উঠবে।"

মুচকি হেসে প্রতিমা ভিতরে পালালো।

* * * *

ছোটনাগপুরের মালভূমি। পাহাড়ের রুক্ষতার মাঝে সবুজ
শালের সমারোহ। ছোট সহরের পাশে ছোট্ট একটা কুটির বাড়ীতে
প্রথম বাসা বাঁধলো নববিবাহিত সৈনিক, রেজিমেন্টের সহকর্মী
অফিসারদের সাহায্য, সৌজন্য আর সদিচ্ছা নিয়ে। ব্যাণ্ড বাজিয়ে
স্বাগত জানালো ওরা সবাই, পার্টি করে নিজেদের মাঝে গ্রহণ করলো
জিতেন আর প্রতিমাকে। নিরিবিলি নৈকট্যে ওদের দেহের ও মনের
বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হলো সনির্বন্ধ সান্নিধ্যে।

* * * *

[illegible] দিনে [illegible] ধা শেষ হলো। সৈনিক চললো আবার দূরে, [illegible] সীমানায়, যেখানে ওর সৈনিক জীবনের শিক্ষা [illegible] ব পূর্ণ পরিণতি। দেশের শেষ সীমায় ভূস্বর্গ [illegible] বুজ উপত্যকার শেষে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের উপর [illegible] রতি রেখা। পাহাড়ের পা ঘেঁষে পাথরের উপর [illegible] যায় শান্ত উলার হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসা অশান্ত নদী ঝিলাম। সন্ধ্যায় লাল হয়ে ওঠে বরফে ঢাকা শৃঙ্গ 'ছোটা কাজিনাগ'।

বাংকারে অর্থাৎ পাহাড়ের গা কেটে বানানো গুহাবাড়ীতে বসে জিতেনের মন চলে যায় অনেক দূরে, পল্লীবাংলার এক কুটিরে। ওখানে ওর প্রাণের প্রতিমা দিন গুণছে কবে ওর কোল ভরবে। অনাগত সন্তানের সত্তা প্রতিমা উপভোগ করে দেহের ভিতর, মন হয়ে ওঠে এক সুমধুর স্বপ্নে সচেতন। সারাদিনের কাজের শেষে বিশ্রামক্ষণে জিতেনের মনকে মাতাল করে এক মধুর চিন্তা। নতুন একটি জীবনের আগমনের আবাহন দোলা দেয় ওর মনকে, ওর রুক্ষ জীবনে এনে দেয় ক্ষণিকের মাধুরিমা।

* * * *

'কমাণ্ডিং অফিসার' কর্নেল 'কন্‌ফারেন্স' ডেকেছেন বিকেল সাতটায়। 'এ্যাডজুট্যাণ্ট' জিতেনের উপর ভার পড়েছে লুকিয়ে খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে—কাঠের পর্দার পিছনে আড়ালে। সকলে কিছুই বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। কন্‌ফারেন্স্ ও খানা-পিনা দুটো তো একসঙ্গে হয় না কখনও! আর 'অ্যাজেণ্ডা?' কর্নেলকে জিজ্ঞেসা করতে বললেন, "তা নিয়ে ওকে ভাবতে হবে না"। পকেট থেকে গোলাপী একখানা কাগজ দেখিয়ে বললেন—"ওতেই সব লেখা আছে"।

যথাসময়ের আগেই অফিসাররা সব 'ফিল্ড ড্রেস' জাব্বা-জোব্বা পরে এসে হাজির হলেন। উৎকণ্ঠায় গলা কারো কারো শুকনো। ব্যাপার কি? এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট্‌কে জিজ্ঞেসা করে জানলেন অ্যাজেণ্ডা

বুড়োর পকেটে, কেউ জানে না। পিছনে টুংটাং [illegible] ?
বোধ হয় কোন মেশিন্‌গান্‌ বসানো হচ্ছে।

ঠিক সময়ে বুড়ো কর্নেল অফিসে এসে ঢুকলেন। [illegible]
গম্ভীরভাবে উঠে দাড়ালো। কর্নেলের মুখ দেখে [illegible]
বড় অপারেশন কিছু হবে। গলা-খাঁকারী দিয়ে শুরু [illegible]।
সবাই ম্যাপ, নোটবুক, পেন্সিল নিয়ে উদগ্র হয়ে ব[illegible]
থমথমে ভাব। বুড়ো সবার দিকে একবার তাবি[illegible]
গেলেন গোলাপী কাগজখানা, টেলিগ্রাম, এ্যাড্‌জুট্যাণ্টের ছেলে
হয়েছে। জিতেনের মুখ খুশীতে লাল হয়ে উঠলো, আর ফেটে
পড়লো কাঠের ছাতওয়ালা সঙ্কীর্ণ 'কমাণ্ড্‌ পোষ্ট' কর্নেলের অফিস
বাংকার উচ্ছ্বসিত অফিসারদের উল্লাস চীৎকারে। কাঠের দেওয়াল
হাতে হাতে সবে গেল। পিছন থেকে 'জোয়ানদের' হাতে হাতে
বেরিয়ে এল একটা টেবিল। তার উপরে প্রচুর খাদ্য আর পানীয়।
হুল্লোড় চললো অনেক রাত অবধি। যাবার আগে কর্নেল জিতেনকে
বলে গেলেন, "ওয়েল্‌ ডান্‌ বয়, অ্যায়সাই করতে রহো।"

সৈনিকের জীবনে এলো এক পরিপূর্ণতা। রুক্ষ জীবনের দুর্ধর্ষ
কঠিন কর্মক্ষেত্রের আড়ালে আছে একটি পিছুটানা মন। সে মন
বন্দী হয়ে থাকে একটি ছোট্ট সংসারের কমনীয় কল্পনায়। দিনের
শেষে মন ভরে ওঠে মধুর চিন্তায়। সৈনিকেরও ঘর আছে, ঘরণী
আছে, আর আছে একটি ছোট্ট শিশুর কল্পিত কাকলি। মনের
চোখ দিয়েই দেখতে পায় সেই শিশুর মূর্তি, শুনতে পায় ওর হাসি,
কান্না ও মিষ্টি আধো আধো কথা 'দা, দ্দা-দ্দা'। বাইরে চাঁদের আলোয়
ইজিচেয়ারে একলা বসে ওর মন ফিরে যায় গ্রামের অন্ধকার একটি
কাঁচা বাড়ীতে যেখানে আছে ওর প্রতিমা আর ওর সন্তান। দুদিনের
জন্যে উপভোগ করে আসা সাহচর্য ওর মনকে ভরিয়ে রাখে নির্জন
একাকিত্বের মাঝে। নিজেকে আর একলা মনে হয় না।

* * * *

অধ্যায় ৫

চালের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। সব জিনিষের দাম আগুন। সবাই একবেলা রুটী খেতে স্বরু করেছে—এক বুড়োরা আর রোগী ছাড়া। এতে চাল বাচে, শরীরও বেশ ঝরঝরে হয়। রেশনের চালে তো একবেলাও পেট ভরে খাওয়া যায় না। তাই বেশী দাম দিয়েও চাল কিনতে হয়। কালো বাজার খোলা বাজার। ভর দুপুরেও খোলা, খোলা রাত দুপুরেও

*　　　*　　　*　　　*

আবার লোকাল ট্রেন। শহরের বাইরের হাজার হাজার লোককে শুষে টেনে আনে পেটের ভেতর। ওরা ঘামতে ঘামতে ছুটে দৌড়ে এসে সেঁধিয়ে যায় ওর গহ্বরের ভেতর। বাড়ীতে শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত গড়িমসি করেও দৌড়ে এসে লোকাল ধরা চাই। লোকালের জন্যে ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে থাকা লজ্জার কথা। এমনি হাজার হাজার লোককে কুক্ষিগত করে তীব্র বেগে ছুটে এসে হাওড়া, শিয়ালদায় উজাড় করে ঢেলে দেয় লাভার মত জনস্রোত, আর এই স্রোত উপচে পড়ে গড়িয়ে চলে 'সাবওয়ের' ভেতরে, বাইরে ও হাওড়া পুলের উপরে।

ভোরের ট্রেন একটা ষ্টেশনে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে উঠে এল পাঁচ জন লোক কাধে চালের বস্তা নিয়ে আর ওপাশের দরজার পাশ দিয়ে তরতর করে গাড়ীর গা বেয়ে ছাতের উপরে উঠে গেল দু'জন লোক। ওরা টেনে টেনে তুলে নিল বস্তাগুলো। আবার নীচে নেমে এসে বিড়ি, সিগারেট ধরিয়ে গল্প স্বরু করে দিল ওরা। ততক্ষণে গাড়ী পরের ষ্টেশনে এসে গেছে। খাকী ইউনিফর্ম পরা তিনজন লোক উঠে এসে ওদের দিকে তাকালো সন্দেহের চোখে। বেঞ্চের আশপাশ তলা খুঁজে দেখলো। চাল নেই তো!

ততক্ষণে ওরা এক এক জন এক এক জিনিষ বিক্রীর জন্যে হাঁকতে

লাগলো, "ম্যালেরিয়ার পর স্বাস্থ্য উদ্ধারের অব্যর্থ উপায়, 'ম্যালো ভাইটো' খান। আর সুধু ভিটামিন টনিক যদি চান তবে আছে এই 'ভাইটো ভিটা' অথবা ডবল শক্তি সম্পন্ন 'ভাইটো ভাইন'"। খাকী পরা লোকগুলো নেমে গেল পরের ষ্টেশনে।

এমনি করে আসে চাল শহরে আর আধা শহরে। এমনি করে প্রাণ হাতে করে এত ঝুঁকি নেয় বলেই এই লোকরা অগুনতি মুখে খাবার তুলে দিচ্চে। বিধিবদ্ধ রেশন, কর্ডন, চৌকী, চুংগী, কে চালাবে এইসব সরকারী ফাঁদের কল ? দুটো চাল মুখে ঠেসে দিলে সব মুখই হয়ে যায় বন্ধ। দুটো টাকার নোট হাতে গুঁজে দিলে হাত হয়ে যায় অসাড়, মন হয়ে যায় নির্বিকার, চোখ দুটো ঘুরে যায় দিগন্তের পানে প্রকৃতির শোভা নতুন করে দেখতে।

* * * *

এক সপ্তার রেশন রিক্সা করে বয়ে এনে ঘরে তুললো বরুণ। সঙ্গে এনেছে দু'দিনের বাজার, সবুজ শাক, ঝিঙে, মোচা, কচু। অমলা বেরিয়ে এসে দেখেই ঝগড়া শুরু করে দিল—"এই বাজার ? ছেলেটা খাবে কি দিয়ে শুনি ?"

বরুণ রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে জিনিষগুলো ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলো। বললো—

"কেন, এই তো সবুজ শাক, ঝিঙে—এগুলো তো ওর খাওয়া প্রয়োজন।"

"আমার ছেলে ওসব শাক পাতা খায় না। ওর দরকার বেশী করে প্রোটিন।"

"তার জন্যে ডিম এনেছি। কিন্তু সবুজ জিনিষও খাওয়াতে শেখাও।"

"হ্যাঁ, শেখাবো না হাতি—ওসব ও মুখেই তোলে না। আলু কোথায় ?"

"আলুর দরকার নেই। যা দাম। কচু দিয়ে আলুর কাজ হয় না ?"

"আলুর বদলে কচু ?" অমলা রাগে ফেটে পড়ে—"ছাখো, তুমি আমাদের কি ভাবো বলতো। ওই যে সারাদিন দাসীবৃত্তি করছি, তার পুরস্কার এই ?"

বরুণ মুচকি হেসে বললো "আহা দাসী কে বলছে তোমাকে। তুমি তো গৃহিণী, ছেলের মা।"

"তাই তো বলছি, মা হয়ে ছেলের পাতে দুটো ভালো জিনিষ তুলে দিতে সাধ হয় না ? শুধু শাক পাতা দিয়ে খাওয়া যায় ?"

"শাক পাতা কেন" বরুণ বোঝায়, "তরকারী, ডিম, ডাল, এসব তো খুব ভাল জিনিষ। আর একবেলা রাত্তিরে রুটি খেতে শেখাও। আটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভাল। তাছাড়া যাতে করে লোভী ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুট্‌ছে, সেগুলো বাদ দিয়ে যদি আমরা চলতে শিখি তবে দেখবে জিনিষ পত্রের এত দাম আর থাকবে না। আর তোমাদের সংস্কার গুলো যদি দূর করতে পারো, তবে দেখবে সুন্দর ভাবে সংসারটি চলে যাবে—ভবিষ্যতের জন্যে কিছু সঞ্চয়ও করে রাখা যাবে। কিছু একটা পূজোর তিথিতে সবাই যখন মাছ, ফল আর মিষ্টি খাবে সেদিন আমরা নাইবা খেলাম, কি এসে যায় ?"

"তা খাবো কেন ? সবাই যা করবে তা থেকে আলাদা একটা করাই তোমার বাতিক।"

* * * *

এক ছুটির দিনে সোনালীর সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল।

"দেখ্ সোনালী, ওর বাতিকগুলোর কথা তোকে সেদিন বলেছিলাম। ওর যেন সারা সমাজের বিরুদ্ধে এক শত্রুতা। সবাই যা করবে বা করতে চায় উনি তা করবেন না। কেন ? বোধ হয় ফাঁকি দিয়ে সস্তায় উনি অসাধারণ হয়ে উঠতে চান কিন্তু শুধু উল্টো পথে চললেই তা হবে ?"

সোনালী হেসে বলে "আমার তো মনে হয় বরুণবাবু ঠিক পথেই চলেছেন। এটা ঘৃণাও নয়, বিদ্রোহও নয়। উনি চান একটা নতুন

পথ যেখানে কোন সংস্কার নেই, গতানুগতিক আচরণের দুর্বলতা নেই। স্বাধীন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই এই গতানুগতিকতায়, এতে শুধু স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই চলে, অকর্মণ্যতার স্রোতে, অনাবিষ্কারের অলসতায়, গড়িয়ে চলা গড্ডলিকায় ”

“কিন্তু সোনালী, ভেবে দেখ্ তো, তুই না হয় বিয়ে থা করিস নি। এসব দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে মেতে থাকা তোর পোষায়। কিন্তু আমার কর্তাটি তো সমাজের একজন অংশীদার, সংসারের টানা পোড়েনে ওর হাত বাঁধা। ওকে বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, সবার সঙ্গে মিলে মিশে চলতে হবে। না কি সব কিছুর বিরুদ্ধাচরণ করে সবাইকে অসন্তুষ্ট করে চলবে?”

এবার বরুণ তর্কে যোগ দেয়, “ওটাই আমার দ্বারা হবে না, মাপ কর। সবাই যা করবে তা আমাকেও করতে হবে কেন? সবাই যদি একটা ভুল পথ নেয়, আর আমি যদি ওটা ভুল বলে বুঝতে পারি তবে ওই পথে না চলার সাহস আমার থাকা উচিত।”

অমলা প্রশ্ন করে “তুমি কি বলতে চাও সবাই ভুল করছে আর একলা তুমিই ঠিক করছো?”

“ঠিক তাই বলবো। তাছাড়া আমি একলা হব কেন। বর্তমান ছেড়ে অতীতেও তো দেখেছ, যখনই কেউ নতুন একটা পথ দেখাতে চেয়েছে, স্থবির স্থাপত্যের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, তাকেই চরম শাস্তি সমাজ দিয়েছে, এমন কি তাকে জীবনও বলি দিতে হয়েছে। তবুও নতুন আবিষ্কার হয়েছে, নতুন চিন্তাধারা রূপ পেয়েছে। প্রতিভাকে হত্যা করে পরে তার আবিষ্কারকেই গ্রহণ করেছে সমাজ কৃতজ্ঞ হয়ে আর প্রতিভাধরের চিতা ভস্মকে মন্দির করে পূজো করে মহৎ করে রেখেছে। আমি প্রতিভাধর নই। কিন্তু আমার একটা আত্মবিশ্বাস আছে যে আমি ভুলের কাছে, কুসংস্কারের কাছে মাথা নোয়াবো না।”

“তোমার এই একগুঁয়েমিতে কি সমাজের কোন উপকার হবে?”

অমলা আবার প্রশ্ন করে।

"সমাজের উপকার করা আমাব দাযিত্ব বলে আমি স্বীকার করি না। সমাজসেবা, পরের উপকাব কবা এসব এক একটা ভান। ওর পেছনে আর কোন স্বার্থ না থাকলেও একটা আত্মপরিতৃপ্তির লোভ আছে, মনকে ভুল বোঝানোর প্রবণতা আছে। নইলে ধনী, গরীব এসবই এক একটা অবস্থার তুলনামূলক সংজ্ঞা মাত্র। সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সমাজ করে না, করে ব্যক্তি। আর জনতা মানে কি? এক মোহগ্রস্ত জনসমষ্টি যাদেব চিব বঞ্চনায় মহান আত্ম ত্যাগের তুষ্টি এনে দিয়ে ভুল বোঝানো হয আর ওদেব উপকার করার অজুহাতে সরকারের বানানো টাকার আরও বেশী কবে হাত বদল হয়. আসলে যা করা হচ্ছে তা মোটেই জনতার উপকাব নয়, এটা জনতাকে শোষণ। তার আত্ম-সম্মান কেড়ে নিয়ে, তাকে আত্মত্যাগীর মোহ আর তৃপ্তি দিয়ে লালন করে তাব তথাকথিত উপকাব করার চেষ্টা করা হয়। উপকার কি হয়? তার জীবন ধারার মান, তার আত্মমর্য্যাদা কি বড় হয়? না, তাকে অপমানিত করে নীচু, ছোট আর দয়ার উপর নির্ভরশীল করে বেখে চিরদিন পঙ্গু কবে রাখা হয়। জন্ম থেকে তাদের শিশুরা জানে ওরা ছোট জাত, গরীব ' যা কিছু সমাজে ওরা পাবে, তা শুধু বড়দের দাক্ষিণ্যেই পাবে—আর দাক্ষিণ্যই ওদের জীবিকা হয়ে থাকবে চির-জীবন। ওরাও বড় হয কখনও কখনও, স্বপ্নে, কল্পনায় আর হিন্দী সিনেমার পর্দ্দায় আলো ছায়ার রঙীন রঙ্গ দেখে।"

"আচ্ছা বরুণবাবু" সোনালী জিজ্ঞেস করে "এ সমস্যাগুলোর সমাধান কিছু পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ পেয়েছি" বরুণ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় "আর পেয়েছি বলেই আমি সুখে আছি। কারণ এই সুখও তুলনামূলক। নহলে এই সমাজের মাপকাঠিতে আমিও গরীব। কিন্তু আমি বলবো, আমি গরীব নই, সম্পদহীন। আমার কোন পার্থিব সম্পদ নেই। কিন্তু আছে একটি মন। এই মন নিয়েই আমি সুখী হয়ে থাকতে পারি

পৃথিবীতে। এতেই আমি ধনী। আমার ধন আমার মনে। কিন্তু আপনার বন্ধুটি তা পারেন না। ওই দেখুন, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওর মনে শান্তি নেই, সুখ নেই, কেন? কারণ ওর মনে একটা জ্বালা আছে, বঞ্চনার জ্বালা, গরীবির জ্বালা। ও ভাবে, আমরা যেহেতু পার্থিব সম্পদে গরীব, তাই সব কিছুতেই বঞ্চিত। ও এক্ষুনি কি বলবে জানেন? বলবে তাহলে সমাজে সংসারী হয়ে বাস করছি কেন? নেংটী পরে সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে গিয়ে বসে থাকলেই হয়—।"

"বলবোই তো, একশো বার বলবো" উপসংহার করে সংসারের দাসী অমলা।

* * * *

বন্যা বন্যা! দেশ ভেসে যাচ্ছে বন্যার জলে। ধানের ক্ষেত ডুবে গেল, কাঁচা বাড়ী ভেঙে পড়লো, গৃহহীন লোক কাতারে কাতারে এসে বাসা বাঁধলো পাকা রাস্তার ধারে ধারে। সরকার থেকে এলো 'তার পলিন', এলো বাশ খড়। এসবের কালো বাজারী করে জনাকয়েকের হাতে এল বেশ টাকা। সরকারী সাহায্য 'ডোল' বা ঋণের টাকা পেতে বেশ দু'পয়সা দক্ষিণাও দিতে হয় স্থানে স্থানে। সরকারী সাহায্যে পেট ভরে খিচুড়ী খেয়ে বাচলো সব হতভাগা সর্বহারাদের দল।

* * * *

বরুণের টেবিলের চারপাশে ভিড়। সরকার থেকে বন্যার জন্যে আগাম টাকা দেওয়া হবে—'ফ্ল্যাড্ এ্যাড্ভান্স্'। ও টাকা সবারই চাই। এটা ওদের দাবী।

"ছাখো, তোমাদের সবাই তো কোলকাতায় বা আশে পাশেই থাকো, বন্যায় তো কোন ক্ষতি হয়নি তোমাদের।" বরুণ ওদের বোঝায়। ওর সম্মতি না থাকলে বড় সাহেব আগাম টাকা মঞ্জুর করবেন না।

"হয়েছে কি না তা ভাববার তো দরকার নেই। সরকার দিচ্ছে, সবাই নিচ্ছে, আমরাই বা বাদ পড়বো কেন?"

বরুণ বলে "দিচ্ছে বলেই টাকাটা নিয়ে নিতে হবে—দরকার থাক বা না থাক, ও টাকায় অধিকাব থাক বা না থাক? ফেরত দিতে তো কষ্ট হবে।"

"তা হোক, ভাগ্যিস ঠিক পূজোর আগে ভাগেই ফ্লাড্‌টা হলো। পূজা এড্‌ভান্স্‌ আর ফ্লাড্‌ এড্‌ভান্স্‌ দুটো নিয়ে বেশ কয়েকটি টাকায় পূজোটা ভালোই কাটবে। আপনি ওতে বাগড়া নাই বা দিলেন বরুণবাবু," ওরা বলে।

"আমি বাগড়া দেবো কেন! যাদের সত্যিই বাড়ী-ঘরের ক্ষতি হয়েছে তারা নিয়ে নাও। স্থানীয় কোন দায়িত্বশীল লোকের চিঠি নিয়ে এসো।"

"এ আবার কি নিয়ম বার কবলেন আপনি। আমাদের সংসারের হাঁড়ির খবর আপনাকে বলতে চাইনা আমরা। আমাদের দাবী, আপনি মঞ্জুর করুন।"

"আমি পাববো না" সাফ জবাব দেয় বরুণ, "আপনারা আমাকে অনর্থক চাপ দেবেন না। ভুল কাজ আমি কবি না, নিজের জন্যেও না—পরের জন্যেও না।"

"ঠিক আছে, আমরা বড় সাহেবকে ঘেরাও করবো। দেখি আপনি মঞ্জুর করেন কিনা" বলে সবাই বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে বড় সাহেবের ডাক এলো। সাহেব বোঝালেন—

"বরুণবাবু, আপনি একজন সেক্‌সন্‌ অফিসার, আপনি রিকমেণ্ড না করলে তো এরা এড্‌ভান্স পাবে না। ওটা করেই দিন, সবাই নিচ্ছে যখন—।"

"আমাকে মাপ করবেন, আনি জেনেশুনে ভুল সার্টিফিকেট দিতে পারবো না।"

"কিন্তু ভুলটা হচ্ছে কোথায়? আপনি তো ওদের কার বাড়ী

কোথায়, কি হয়েছে না হয়েছে জানেন না। ওরা নিজেরাই যখন বলছেন, আপনার আপত্তি করা উচিত নয়।”

“তাহলে আপনিই দিয়ে দিন না আমাকে পাশ কাটিয়ে?” বরুণ বলে,

“তাই দেবো। আর আপনিও তৈরী থাকুন। এখানে এরকম ভাবে আর আপনার চলবে না। আপনার বদলী হবে শীগ্‌গীরই এ অফিস থেকে—কোলকাতা থেকে।”

“আপনি এভাবে আমার সততার পুরস্কার দিচ্ছেন?” প্রশ্ন করে বরুণ।

“সততা!” হেসে উঠলেন বড় সাহেব, “আপনি যাকে সততা বলে ভেবে একটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে থাকতে চান, তাব কোন দাম নেই আজকালকার দিনে। নিয়মকানুনগুলোর দাস হয়ে গেলে আজকাল চলে না। ওগুলো একটা বাঁধাধরা গৎ হয়ে চলেছে।

সরকারের একটা ঠাঁট্ বজায় রাখতে ওই নিয়মকানুনগুলো বানাতে হয়, কেউ ঠিকভাবে মেনে চলবে বলে নয়। বুঝলেন মশাই, নিয়ম মেনে এক পা চলা সম্ভব নয় কারো। তাই কেউ নিয়ম মানে না। আপনিও মানেন না। এই যে সেক্‌সন্ অফিসার হিসেবে আপনার দায়িত্ব প্রত্যেকটি লোক ঠিক সময়ে এসে হাজির হবে। আপনি সে দায়িত্ব পালন করছেন?”

“কিন্তু আমি তো ওদের সময় দিয়ে বাঁধি না, বাঁধি কাজ দিয়ে। কাজ করে না দিয়ে কেউ আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যায় না।”

“যাবে আজ থেকে” সাহেব জবাব দেন, “ওদের মূড্ দেখেছেন? আমাকে ওদের দাবী মেনে নিতেই হবে। মাঝখান থেকে আপনি শুধু অপ্রিয়ই হলেন না, ওদের উপর আপনার কর্তৃত্বের অধিকারও আজ থেকে কমে গেল। কথাগুলো ভেবে দেখবেন।”

* * * *

পূজো এসে গেল, বরুণের বাড়ীতেও অশান্তি সুরু হয়ে গেল।

মহালয়া থেকে সুরু হয় নানা রকম আচার আচরণ। বরুণ বোঝায় অমলাকে—

"আচ্ছা অমু, এইসব আচরণগুলো না করলেই নয়! এসব তো একটা সংস্কাব মাত্র। এতে ফল কি হয় বলতে পারো?"

"তোমাকে বলে আর লাভ কি বল। তুমি তোমাব নাস্তিক মন নিয়ে কি এসব বুঝবে?"

"সত্যিই তো, বঝিনা বলেই তো তোমাব কাছে বুঝতে চাই।"

"আমাব কাছে কেন? আমি কি ধর্মগুরু না মন্দিরের পূজারী যে তোমাকে ধর্ম বোঝাবো। ধর্মেব বইগুলো তো ছোবেও না। তাহলে ধর্মে মতি হবে কি করে আর বুঝবেই বা কি করে?" অমলা জবাব দেয়। ওর বিশ্বাসকে ঠাট্টা করে বলে বরুণের উপর রাগ হয়।

*   *   *   *

পূজোর আগেই বরুণের বদলীর আদেশ হলো। ছুটির আগেই চলে যেতে হবে মেদিনীপুর।

অমলা তো কেঁদে পড়লো "যাও নাগো, বল না বড় সাহেবকে বদলীটা রদ করে দিক।"

"না," বরুণ জবাব দেয়, "কোনদিন কারো কাছে মাথা নোয়াই নি আর আজ ওই দুর্বল অফিসারের কাছে ঠিক কাজ কবার জন্যে মাপ চাইতে যাবো? একথা তুমি ভাবলে কি করে?"

"ওই তো মুশকিল তোমাকে নিয়ে। তুমি যাকে ঠিক কাজ বলে ভাবো, অন্য সবাই যে তাকে ভুল বলে!"

"কেন, তোমার কাছে তো ভগবান জাগ্রত। এই ভেবে সান্ত্বনা নাও না যে ভগবান নিশ্চয়ই বুঝবেন কোন কাজ ঠিক।"

"সে সান্ত্বনা নিতে পারলে তো ভালোই হতো। কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হয়। সবাই বলে ভুল, আর তুমি বল ঠিক। আমার মন বলে হয়তো তোমারই ভুল।"

"না অমলা, আমার ভুল নয়। আমি আবার বলবো, 'আমার একটি মন আছে।' সে ঠিক বেছে নিতে পারে কোন পথ খাঁটি আর কোন পথ মেকী।"

"সবাই কেন তা পারে না? ওদেরও তো মন আছে।"

"কি জানি অমলা। কেন যে আমি 'বেয়াড়া' হয়ে গেলাম, কি করে যে আমার মন একটা আলাদা পথ নিতে চায় তা আমি বুঝতে পারি না। আমি জানি আমি অপ্রিয়, অসামাজিক। আমাকে সবাই আলাদা করে দূরে রাখতে চায়। কেউ কেউ আবার ভয়ও করে আমাকে। কেউ করে অবজ্ঞা, কেউ আমাকে শাস্তি দিয়ে চায়—মেদিনীপুরে বদলী করে দিয়ে, কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ট্রেন থেকে। কিন্তু আমার মন বলে, এ শাস্তি নয়। আমার মন তো ভয় পায় না, দুঃখ করে না। এটা যেন আমার নিয়মমাফিক পাওনা আমার বেয়াড়া পনার দেনার বদলে। তোমরাই শুধু ভেবে আকুল হয়ে যাও। আমাকে করুণা করো না দোহাই তোমাদের। আমি বেশ সুখে আছি। পূজোর সময় বাইরে গেলে কি হয়? আমরা বাইরে যেতে চাই না বলে আমাদের কত সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। আর এ তো ঠিক বাইরে নয়। অন্য সময় বাড়ী ছেড়ে যাওয়া যায়, আর পূজোর সময় যায় না এটা হবে কেন? আসলে মনে জোর থাকলে সব কিছুই কেমন সহজ স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু তোমার মন বড় দুর্বল অমু। তুমি আপাত দুঃখকে সহজ ভাবে নিতে পারো না, মুষড়ে পড় একটুতেই।"

* * * *

শনিবারের বিকেল। বাড়ীতে যাওয়ার আগে বরুণ একটু গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একলা। মনে অনেক চিন্তা। হঠাৎ সোনালীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও ও একলা। সোনালীর সঙ্গে আলোচনা করতে ওর ভাল লাগে।

"আসুন না, একটু মাঠে বসা যাক," বরুণ অনুরোধ করে।

সোনালী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। ওরও ভাল লাগে বরুণকে, ওর ব্যক্তিত্বকে, ওর বেয়াড়াপনাকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসার পর সোনালীই প্রথম কথা তুললো, "আপনাকে চিন্তিত দেখছি। কেন ?"

বরুণ একটু হেসে জবাব দেয় "হ্যাঁ, চিন্তিত বইকি। আমি কিন্তু আমার নিজের জন্যে ভাবি না। আমি সব অবস্থাতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আপনাব বন্ধু অমলাকে নিয়ে !"

"কেন আবার কি হলো ?"

"হয়নি কিছুই। তবে হবে। আমার মোদনীপুরে বদলী হয়েছে। ও তো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কেন বলুন তো। বলছে পূজোর আগেই চলে যাওয়া, এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা। ওরা অবশ্য আপাততঃ এখানেই থাকবে। তবে এতে দুঃখের কি আছে আমি তো বুঝি না। সরকারী কাজে যে কোন জায়গায় আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু এ যাওয়াটা একটা শাস্তির মত হচ্ছে বলে ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না এটাকে।"

"শাস্তি কেন, আপনি কি করেছেন ?" জানতে চায় সোনালী।

বরুণ সব বুঝিয়ে বললো। বরুণের উপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। অনেক কথা হলো ওদের। সন্ধ্যে হয়ে এলো। জমাট অন্ধকার দূরের আলোকে অবজ্ঞা করে চেপে বসল ওদেব চার ধারে। কথা শেষ হলো।

*　　*　　*　　*

"এই যে বরুণবাবু, বসুন।" বড় সাহেব সামনের চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করেন। বরুণ বসলো।

"আপনাকে একটা বিদায় সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে—আজ বিকেলের দিকে।"

"দরকার কি ?" বরুণ জিজ্ঞেস করে, "আমি তো পেন্সনে যাচ্ছি না।"

"তা হলেও, আপনি যখন চলে যাচ্ছেন, তখন সবাই আপনাকে একসঙ্গে বিদায় দিতে চায়। এর জন্যে অবশ্যি কিছু চাঁদাও দেবে সবাই, এই ওরা ঠিক করেছে।"

"বিদায় দেয় লোকে যাকে ভালবাসে, যার জনপ্রিয়তাকে স্বীকার করে। কিন্তু আমি তো অপ্রিয় হয়ে বিতাড়িত হচ্ছি। আমাকে আবার সম্বর্দ্ধনা কেন? এটা কি একটু ভণ্ডামি হচ্ছে না?"

"তা হোক, বরুণবাবু, কিন্তু আপনি এতদিন এই সেক্‌সনে কাজ করলেন, অনেক ভাল কাজও করেছেন, সেটাও তো ওরা স্বীকার করতে চায় আপনার বিদায়ের সময়।"

"দেখুন, আমি বিশেষ কিছুই করিনি। আমরা সবাই নিজের নিজের জায়গায় কাজ করে যাচ্ছি। আর ঠিক কাজ করার জন্যে পুরস্কারের দাবী কারও হয় না ঠিক কাজ করাটাই নিয়ম। আমি সেই চেষ্টাই করেছি সব সময়। কিন্তু আমি দেখেছি বেশীর ভাগ লোকই সেটা করতে চায় না। দাবী করে ওরা নিজের পুরো প্রাপ্য। কিন্তু তার বদলে আনুগত্য নিয়ে কাজ করতে কেউ চায় না। আর আপনার মত মহৎ উদার অফিসারদের দুর্বলতার সুযোগ ওরা পুরোপুরি নিয়ে থাকে।"

"বটে," এবার বড় সাহেব রেগে যান, "আপনি বলছেন সৎ, অনুগত হয়ে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো, আপনি কি সততা পালন করছেন সব সময়?"

বরুণ একটু ইতস্ততঃ করে চুপ করে রইলো।

"বরুণবাবু, আমি সব খবর রাখি। এমন কি একটি কালো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতারও। বুঝেছেন? এ খবরটি যদি আপনার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে যায় তবে কি হবে?"

"কিন্তু, ও তো আমার স্ত্রীর বিশেষ বন্ধু। ও তো……"

"থাক আমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। স্ত্রীর বন্ধুকে নিজের বন্ধু করে নেওয়া তো আরও সহজ, এটাই সাধারণ

লোকে বোঝে। আপনি তো অসাধারণ। তাই আপনি অবুঝের ভান করেন। আপনি তখন চুপ করে ছিলেন কেন? বালিধারার কণ্ট্রাক্টরকে মনে পড়ে আপনার? বলুন এবার আপনারও দুর্বলতা আছে কিনা।"

বরুণের মনটা ওই তিক্ত স্মৃতিতে বিষিয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে মন ঠিক করে নেয়। বলে "হ্যাঁ, বালিধারার পাষাণ সত্যিই আমাকে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়ে গেছে, আমার অনুপস্থিতিতে। ওই একবারই আমার পদস্খলন হয়েছে আর আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আপনি এত খবর কি করে পান? নিশ্চয়ই আপনার একটা জাল পাতা আছে। কিন্তু এত উঁচু পদে থেকে আপনার পথ এত... ..."

"নীচু কেন, এই তো? আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি আছেন অনেক আগের যুগে।"

"আগের যুগে নয়, বলুন পরের যুগে" বরুণ জবাব দেয়।

* * * *

বাড়ীতে ঢুকেই বরুণ অমলাকে বললো, "সেই একশোটি টাকা, মনে পড়ে? এক্ষুণি সেটা দিয়ে দিতে হবে। দাও," অমলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, "সে টাকা কি এখনও আছে? হায়রে কপাল আমার। কি করে যে আমি সংসার চালাচ্ছি যদি জানতে। ভাগ্যিস বন্নু... ..." অমলা চুপ করলো। এবার বরুণের অবাক হবার পালা! "কি বন্নু, কোথায় বন্নু, কি করেছে?" "ও কথায় কাজ নেই। টাকা ফাকা পাবে না। এখন ওই টাকার কি দরকার পড়লো শুনি?"

"ওটা পাপের টাকা, ভুলের টাকা" বরুণ চাপ দেয়, "তুমিই বলেছিলে না আমার পথই ভুল। এখন সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। দাও টাকা। বন্নু কি করেছে?"

"কিছুই করে নি তো।"

"না, আমাকে লুকোবার চেষ্টা কোরোনা অমলা। আমি বুঝেছি। বন্নু তোমার সংসার চালাতে সাহায্য করছে। বল সত্যি কিনা। বন্নু কোথায় ? না বললে যে অপরাধী হবে পুলিশের চোখে। পুলিশ যে ওকে অনেক দিন ধরে খুঁজছে। অথচ তুমি জেনে শুনে চুপ করে আছ। বল বন্নু কোথায়।"

"আমি জানিনা কোথায়। বলে গেছে অন্যদেশে যাচ্ছে, সে কোন দেশ তা বলেনি। অনেকদিন আগেই চলে গেছে।"

"তাহলে তুমি কি বলছিলে ?" বরুণ জবাব চায়।

এবার অমলা কান্নায় ভেঙে পড়ল। চোখে আঁচল চেপে ঘরের ভেতর গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে বের করে আনলো একটা রুমালে বাঁধা পুঁটলি।

বরুণ জিজ্ঞেস করে "কি আছে ওতে ?"

"ওতে আছে অনেক টাকা। বন্নু যাওয়ার সময় দিয়ে গিয়েছিল। আমি ও থেকে কিছু খরচ করেছি। বাকীটা দিয়ে তুমি তোমার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

বরুণ পুঁটলিটা খুলে অবাক হয়ে গেল। ভেতরে রাশি রাশি টাকা, একশো টাকার নোট। তা থেকে একখানা পকেটে নিয়ে বরুণ আবার বেরিয়ে গেল। অমলা পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে রেখে দিল তাকের উপর, ওতে আর হাত দেবে না। যা করার বরুণই করবে ভেবে নিশ্চিন্ত হোল।

* * * *

না ডাকতেই বড় সাহেবের ঘরে এসে ঢুকলো বরুণ।

"এই যে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, কি মনে করে ?" সাহেব প্রশ্ন করেন।

বরুণ গম্ভীরভাবে একশো টাকার নোটটা টেবিলের উপর রাখলো। "এটা আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত" বরুণ বলে।

"মাত্র এই বরুণবাবু ?" বড় সাহেব অবাক হবার ভান করেন, "মাত্র একশো টাকা দিয়ে এতদিনের ভুলের দাম হয় ? আমি কি কচি ছেলে ?"

"মাত্র এতেই আমার ভুল সীমিত, আমি আর কিছুই নিইনি।"

"নিইনি না পাইনি বলুন। ঠিক আছে। ওটা এখানেই রেখে যান। পরে জানতে পারবেন।"

বরুণ চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে গেল। অফিস থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসলো।

* * * *

বরুণের সহকর্মীকে ডেকে সাহেব বললেন, "ঐ টাকাটা রেখে দিন। 'স্পেশাল ফাণ্ডে' যাবে"

সহকর্মী একটু হেসে টাকাটা পকেটস্থ করলেন। পূজো এসে গেছে। টাকাটা কাজ দেবে। স্পেশাল ফাণ্ডের মানে কারও অজানা নয়। এমনি ছিঁটে ফোঁটা নীচের তলার লোকদের ফাণ্ডে, বড় রুই কাৎলা বড় জালে ধরা পড়ে বড় ফাণ্ডে যায়, উপরের তলায়। নীচের তলা দিয়েই উপরে যায়। ভাঙন ধরলে অবশ্য প্রথমে নীচের তলাতেই ধরে। তবে খুব কম, মাঝে মাঝে।

"দাঁড়ান, নোটখানা, দিন" সাহেব ডেকে ফেরালেন তাঁকে।

নোটখানা হাতে নিয়ে একটু চিন্তা করে এককোণায় ছোট্ট একটা সই দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন "এটা বরুণবাবুর ড্রয়ারে রেখে দিন। আমি পুলিশে টেলিফোন করছি, ওরা এলে ড্রয়ারটা দেখিয়ে দেবেন।"

"কিন্তু ......" ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করেন।

"আবার কিন্তু কি মশাই?" সাহেব ধমক দেন, "আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন বরুণ সরে গেলে প্রমোশনের চান্স্ কার? এটাও আমাকে বলে দিতে হবে?"

"সে স্যার আপনার দয়া। কিন্তু......."

"ঐ কিন্তু কিন্তু করলে মশাই জীবনে কিছুই হবে না। সুযোগ একবারই আসে আর এলে তাকে লুফে নিতে হয়। সেন্টিমেন্ট্ দিয়ে তাকে যদি ফিরিয়ে দেন, তবে চলে যাবে, যাবে অন্যলোকের

দরজায়। আমি বরুণকে শুধু এখান থেকে নয়, চাকরী থেকেই ছাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। ও একটা 'মিস্‌ফিট্‌।' ওর প্রভাবে একদিন আমার, আপনার, সবারই ক্ষতি হতে পারে।"

"কিন্তু স্যার, সামান্য কারণে একেবারে বরখাস্ত করা কি ঠিক হবে?"

"দেখুন, আপনার মন বড্ড নরম। এসব ব্যাপারে করুণার স্থান নেই। তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করুন। আজ বরুণের পায়েব তলা থেকে মাটি সরে যেতে বাধ্য, কাবণ আজ প্রথম বরুণ প্রকাশ্য বিদ্রোহে নেমেছে ওর ষ্টাফ এর সঙ্গে। এতদিন হয়তো ভেতরে আগুন জ্বলছিল, আজ তা খোলা হাওয়ায় জ্বলছে। এখনই বরুণকে চরম আঘাত না হানলে এ বিদ্রোহ একদিন সবাইকে পুড়িয়ে মারবে। চুপটি করে যা বলি করুন, যান।"

ভদ্রলোক আবাব অনুরোধ করেন। ঠিক পূজোর আগে একশোটি টাকা।

"আমি বলি কি স্যার, ঠিক পূজোর আগেই· ··স্পেশাল ফাণ্ডের অবস্থাটা এইসব ঝামেলা —পুলিশ কেস···"

সাহেব একটু ভেবে বল্লেন—"আচ্ছা ঠিক আছে। দিন, সইটা কেটে দিই।"

বিকেলের দিকে বরুণ এল। সোজা সাহেবের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর একখানা সাদা কাগজ রাখলো।

"ওটা কি?" সাহেব প্রশ্ন করেন।

"নোটিস, পদত্যাগ পত্র" সংক্ষেপে জবাব দেয় বরুণ। নমস্কার করে নিজের টেবিলে এসে বসলো। এতদিনেব অভ্যস্ত এই টেবিল। কিন্তু এই টেবিলের ড্রয়ারেই তো সুরু। আজ এখান থেকেই শেষ। কাজের ভার অন্যকে বোঝাতে অন্য টেবিলে বসেই চলবে। উঠে সোজা বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

বাড়ীতে এসে গম্ভীর হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ। বার বার

জিজ্ঞেস করেও অমলা কোন জবাব পেল না। তারপর যখন পেল, তখন বরুণ টাকার পুঁটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"কোথায় যাচ্ছো?" অমলা প্রশ্ন করে।

"থানায়, পুলিশের কাছে জমা দিতে," বলে বরুণ বেরিয়ে গেল।

রাত্তিরে অমলা ধরলো বরুণকে, "বল না গো, কি হয়েছে। টাকাগুলো তো বিদেয় করেছো। ভালই হলো। ওতে যদি তোমার মনে শান্তি আসে, কিন্তু আসেনি তো। কি ভাবছো?"

"ভাবছি কি করবো এখন। চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।"

"সে কি?" অমলা হতবাক হয়ে যায়, "চাকরী··· ছেড়ে দিয়েছ? সরকারী চাকরী এক কথায় ।"

"এক কথায় নয় অমলা। অনেক কথা। মনে অনেক কথা জাগছে। সবগুলো একটু ভাবতে দাও।"

"আর কত ভাববে! আমি জানতাম এরকম একটা কিছু হবেই। তোমার পাগলামি দেখে এসেছি এতদিন। সয়েও এসেছি ভয়ে ভয়ে। কিন্তু সে ভয় যে এই পরিণতিতে এসে পৌছোবে সে আমি চিন্তা করতে পারিনি। ওগো, তুমি তোমার ও গোয়াতুঁমি দিয়ে কি আমাদের ভাসিয়ে দেবে? একবার ভাবলেও না আমার কথা, রাজুর কথা?"

"ভেবেছি অমলা, অনেক ভেবেছি। তুমি শুধু আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখো। আমাকে সাহায্য কর অমলা। আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না। আমাকে একটা পরীক্ষা করতে দাও। এই সমাজের সঙ্গে একটু লড়াই করতে দাও।"

"কিন্তু তোমার শক্তি কতটুকু"—অমলা অনুযোগ করে, "তুমি ভাবছো তোমার মনের বলে তুমি অসীম বলীয়ান। কিন্তু আবার ভুল হচ্ছে তোমার। সমাজের দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তুমি পারবে না। পদে পদে হেরে যাবে।"

"গেলামই বা অমু। হেরে গিয়েও মাথা নুইয়ে না দেওয়াতে যে তৃপ্তি সেটা তো পাবো।"

"তাতে পেট ভরবে ? বাস্তব আর দার্শনিক কল্পনার প্রভেদ কি বুঝবে না তুমি কোন দিন ?"

"তাই তো, পেট ভরাতে হবে তো", বরুণ চিন্তিত হয়, "আচ্ছা পেট ভরানো আর মন ভবানো দুটোই হতে পারে না ?"

"তাই তো হয় আর সকলের বেলায়। কিন্তু তুমি যে আমার পাগল স্বামী। আমি আর তোমার বিরুদ্ধে যাবো না। সত্যি বলছি, আর কখ্খনও না।"

* * * *

পূজো এসে গেল।

"চল অমলা, দেশেব বাড়ীতে ফিরে যাই।" প্রস্তাব করে বরুণ।

"এখনই যাবে, একেবারে ?"

"না এখনই একেবারে নয়। ছুটির পর এসে কাজের ভার বুঝিয়ে দিতে হবে অন্যকে। তারপর।"

"তারপর কি হবে ?" অমলার ভয় করে।

"কেন, বাড়ীতে চাষবাস করবো, পুকুরে সাঁতার কাটবো, মাছ ধরবো। আর কিছুদিন পরে হয়তো গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করবো।"

"এত লেখাপড়া শিখে, প্রতিযোগিতায় ভাল সরকারী চাকরি পেয়ে, তারপর এই দশা হবে তোমার ?" অমলার কান্না পায়।

"দশাটা কি খারাপ হলো ?" বরুণ বলে, "দেখলাম তো সবই। কিন্তু মন যে বসলো না। ওদের সঙ্গে মনের মিল যে হলো না।"

"তোমার মনের মিল কারও সঙ্গে হবে না। তা ছাড়া তোমার দাদা-বৌদির মনের দিকটা একবার ভেবে দেখেছ ? না, দেখনি। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। দাদা খুবই ভাল লোক, আপনভোলা মানুষ। কিন্তু বৌদি ? হাজার হোক, সংসারের স্বার্থ, নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা আমরা মেয়েরাই করি। তোমাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে তোমারও সমান দাবী আছে জানি। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় সব দাদার কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলে চিরদিন বাইরে থাকবে

মনে করে। বৌদির তাতে দুঃখ হওয়ার তো কথা নয়। এতদিন ধরে সব নিয়ে ওঁরা যে গুছিয়ে বসেছেন তাতে ভাগ বসাতে গেলে যতই তোমার দাবী থাক তোমার বৌদির মন মানবে না। অশান্তি হবে।"

"আচ্ছা অমলা, তুমি যদি বৌদির জায়গায় হতে তা হলেও কি ঠিক তাই ভাবতে?" আচমকা প্রশ্ন করে বরুণ।

অমলা সচকিত হলো একটু। চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "ঠিক ভাবতাম। হাজার হোক আমার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ আমাকেই ভাবতে হবে। তোমরা পুরুষেরা ভাবো সংসারের দায়িত্ব, উপার্জনের দায়িত্ব তোমাদের, আর ঐটুকু করেই তোমরা খালাস। গভীরভাবে নিজের স্বার্থচিন্তা তোমরা করতে পারো না। এই তুমি আর দাদা। তোমরা ভাববে, কেন, যা সম্পত্তি আছে তাতে দুটো পরিবারের বেশ ভালভাবেই চলে যাবার কথা। কিন্তু আমরা মেয়েরা বুঝি, যাবে না। তাই অশান্তি হবে, আর তাতে জড়িয়ে পড়বে তোমরাও।"

"ছি ছি অমলা, তোমার মন তো খুব সরল বলেই জানতাম।"

অমলা এবার একটু হাসলো।

"তুমি ভাবছো আমি খুব একটা কুটিল যুক্তি দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু আসলে ঠিক তার উল্টো। আমার যুক্তিতে স্বার্থসিদ্ধি কার হবে ভেবে দেখেছ? আমি তো তোমাকে কোন স্বার্থপর দাবী করতে বলছি না, আমি বলছি দাবী ছেড়ে দিতে। আমি বলি কি, আমরা বাইরেই থাকি আলাদা। তোমার দাবী তোমারই থাক, অথবা লেখাপড়া করে দাদাকে দিয়ে দাও তাতে আমি কিছু আপত্তি করবো না। কিন্তু ঐ দাবী নিয়ে একটা মনকষাকষির মধ্যে যেতে আমার আপত্তি। তার চেয়ে আমাদের বাইরে থাকাই ভাল।"

"তাই থাকবো। অন্ততঃ আর একবার চেষ্টা করে দেখবো। এখন ছুটিতে একবার দেশের বাড়ী ঘুরে আসি চল! জান অমলা, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে বাড়ী ফিরে যেতে। হাজার হোক, জন্মস্থানের একটা

টান আছে তো। মনে হয় কত ভাল হয় যদি আবার আমার দেশের মাটির কোলে ফিরে যাই, মাঠে মাঠে গায়ে কাদা মেখে ঘুরে বেড়াই। সন্ধ্যেবেলা এসে বারান্দায় পাটি পেতে বসি। গাছে গাছে ছোট্ট পাখীর কিচিরমিচির ডাক, রাতে জোনাকীর মালা।"

"আর মশার প্যান্প্যানানি, আর ব্যাঙ-এর ডাক", অমলা যোগান দেয়।

"হ্যাঁ, তাও ভাল লাগবে। ওদের সঙ্গে যে আমার ছোটবেলার প্রাণ বাঁধা পড়ে আছে।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, দেখবো," অমলা সব বোঝে, "দুদিন পরেই মনে হবে পালিয়ে বাঁচি। দেখে নিয়ো।"

"নেবো, দেখতেই তো যাচ্ছি," বরুণ এক কথাতেই সাহস হারায় না। "পাড়াগাঁয়ে একটা শান্তি আছে। ওখানে কেউ কারও শত্রুতা করে না, যে যার নিজের কাজ নিয়ে থাকে, নিজের সামান্য সমস্যাগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে সব সময়। অন্যের সমস্যায় আনন্দ উপভোগ করে না, অন্যের দুঃখে সুখী হতে চায় না।"

"আচ্ছা, এ তুমি কোন আদর্শ গ্রামের কথা বলছো?" অমলা জানতে চায়, "আমিও তো গ্রামের মেয়ে। আমি তো দেখেছি সবই এর উল্টো। আচ্ছা, তুমি তো কারও সঙ্গে না মিশে একলা থাকতেই ভালবাসো। গ্রামে গিয়ে সবার সঙ্গে মিশবে?"

"মিশবো", জবাব দেয় বরুণ।

"ঠাকুর দেখতে যাবে?"

"যাবো।"

"ঠাকুর প্রণাম করবে?"

"না।"

"তবেই হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি তোমার কি হবে কারো সঙ্গে কোন আলোচনায় বসলেই তোমার অদ্ভুত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় হবে ওদের। আর তোমাকে একলা ফেলে রেখে সবাই

পালাবে। তুমি সেই একলাই বসে বসে ভাববে। আচ্ছা, তোমার কি কেউ কোনদিন সংস্কার করতে পারবে না?"

"পারবে যদি সবাই কুসংস্কারগুলো ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে আসতে পারে, আমার সঙ্গে মন মেলাতে পারে।"

* * * *

গ্রামের বাড়ীতে এসে পৌঁছলো সবাই সন্ধ্যের পর। এসেই তো রাজু ধরে বসলো পুকুর দেখবে। বাবার কাছে অনেক গল্প শুনেছে বড় পুকুর আছে বাড়ীর বাইরে। শেষ পর্য্যন্ত অন্ধকারেই পুকুর দেখে তবে শান্তি হলো। বলে রাখলো সকাল হলেই বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে রাজু।

ভোর হতেই রাজু ডেকে তুললো বাবাকে। তক্ষণি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছোট্ট ছিপ বানিয়ে দুজনে গিয়ে ঘাটে বসলো ছিপ পেতে। একটু পরেই রাজুর ছিপে একটা পুঁটিমাছ লাগলো আর সেটাকে বড়শীশুদ্ধ ঝুলিয়ে নিয়ে "মা, ধরে ফেলেছি" বলে রাজু ছুটে বাড়ীর ভিতর চলে গেল মাকে দেখাতে ওর প্রথম ধরা মাছ।

"বাবা, ছোটবেলায় তুমি কোন্ গাছে চড়তে?" রাজু প্রশ্ন করে বরুণকে।

"সে কি আর আছে রে এখনও?" বরুণ উত্তর দেয়, "কবে বাজ পড়ে পুড়ে মরে গেছে।"

"বাবা, বাজ কি করে পড়ে? কে ফেলে? ভগবান? গাছে একটা জালের কাঠি লাগিয়ে দিলে না কেন তোমরা? তা হলে তো ওর কিছু হতো না।"

"তোর মাথায় ঢুকেছে এই জালের কাঠি। শোন, ঐটা ছিঁড়ে পুকুরে ফেলে দে না," বাবা ছেলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

"ওরে বাবা, মা বকবে। তা ছাড়া শনিঠাকুর রাগ করবে যে।"

"করবে না কি? তা হলে থাক বাবা। তোর মা আর শনি-ঠাকুর, দু'জনেরই যা মেজাজ!"

ছুজনে এসে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসলো। তেল দিয়ে মাখা মুড়ি খেতে খেতে বরুণের ছোট বেলার গল্প শুনতে লাগলো রাজু।

অমলা মুচকি হেসে এসে দাঁড়ালো, বললো, "হয়েছে বাপ-ছেলের বাড়ী দেখা ?"

"না মা, মুড়ি খেয়ে আমরা মাঠে যাবো, ধানের গাছ দেখতে। বিরাট বড বড় গাছ, বাবা বলেছে। ডালে ডালে কত ঘুঘুপাখী বসে আছে। না বাবা ?"

"দুর বোকা, ও ধানের গাছ নয়, মন্দার।" তারপর অমলার দিকে ঘুরে বললো,

"রাজু কিন্তু তোমার ভীষণ ভক্ত। এক্ষুণি বলছিলাম জালের কাঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে, তা শুনলো না। বলে মা আর শনিঠাকুর দু'জনেই রাগ করবে।"

"হয়েছে, শনিঠাকুর আর আমি কি সমান যে একদলে ফেলছো ?"

"আরে আমি কি ফেলেছি ? তোমার ছেলেই বললো। আচ্ছা ঐ জালের কাঠি, ওতে সব বিপদ থেকেই রক্ষা পাবে তো ? ওর প্রাণের ভয় নেই তো ? ওই যে ঠিকুজীতে লেখা আছে ওর জলে ভয়, তা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখুক না একবার। আমি কাছেই থাকবো।"

"সব কিছুতে ঠাট্টা ভাল লাগে না, নাস্তিক !" অমলা ভিতরে চলে গেল গজ গজ করে।

রাজু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললো, "বাবা, তুমি মাকে অসন্তুষ্ট কোরো না শনিঠাকুর রাগ করবে। মাকে যে ঠাকুর ভীষণ ভালবাসে।"

"তাই নাকি, আমাকে ভালবাসেন না ?"

"না, তুমি যে ওকে কুসম্‌কার বল।"

বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোলো বরুণ রাজুকে নিয়ে। পড়শী বসন্তকাকা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। বরুণকে দেখে খুব আদর করে ডেকে বসালেন,

"এসো বাবা বরুণদেব, অনেক দিন পরে দেশের মাটিতে পা পড়লো। এটি তোমার ছেলে, বেশ বেশ। আর সন্তানাদি কি?"

"আর নেই কাকা, এই একটিকেই ভাল করে মানুষ করে তুলতে পারলে যথেষ্ট।"

"কি যে বল বাবা। একটিতে কি ঘর ভরে? তা যাক, কতদিন থাকবে?"

রাজু বাবার হাত ধরে টানতে লাগলো, "চল না বাবা, ঐ গরুর বাচ্চাটাকে দেখি, কি সুন্দর দেখেছ?"

"যাও, তুমিই গিয়ে দেখ। কিন্তু খুব কাছে যেয়ো না, ওর মা গুঁতিয়ে দেবে।"

"কেন বাবা? আমাকে কেউ আদর করতে চাইলে মা তো রাগ করে না।"

"তোমার মা মানুষ, আর ও যে গরু। ওদের বুদ্ধি কম তো, তাই বোঝে না। যাও।"

রাজু সরে যেতেই কাকা জিজ্ঞেস করলেন, "তা তুমি তো সরকারী চাকরী করছ, বেশ বড় কাজ শুনেছি, কত মাইনে দেয়?"

"চাকরী ছেড়ে দিয়েছি কাকাবাবু। ওতে আর মন বসলো না।"

"বল কি হে, সরকারী চাকরী, ভাল কাজ, নিজে থেকে ছেড়ে দিয়েছ? কাজটা ভাল করলে না তো বাবা। এখন কি করবে?"

"কি করবো ঠিক করিনি এখনও। ভাবছি এখানে বাড়ীতে থেকে গেলে কি হয়?" বরুণ ওঁর উপদেশ নিতে চায়।

"সেটা তো খুবই ভাল হয়," বুড়ো বলেন গলার স্বর নীচু করে, "তোমাদের এত বিষয়-সম্পত্তি, তোমারও তো অর্ধেক অংশ। সব দাদাকেই ছেড়ে দিয়েছ কেন হে? তোমার ভাগ তুমি নিয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা কর ভাল করে। একটা ভাল আয়ের পথ তো তোমার দাদা হেলায় হারাচ্ছে", বুড়ো যুক্তি দেন।

"দেখুন, আমার সম্পত্তিতে লোভ নেই। ও দাদাই দেখুন। আমি শুধু এখানে থাকলে যদি দাদার সাহায্য হয়, তবেই থাকবো।"

"কেন, লোভ নেই কেন? বুঝতে পারছো না এরকম করে তোমার অংশের দাবী তোমার একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে! একটু বৈষয়িক হও হে, বুঝলে। আজকাল এত ত্যাগ-তিতিক্ষা করলে চলে না। শেষে তোমরাই ঠকবে।"

"ঠকাঠকির কি আছে নিজের ভাইএর কাছে? তা ছাড়া, আমি তো লেখাপড়া করে কিছু দিইনি দাদাকে।"

"কক্ষনও দিও না বুঝলে। এমনিতেই আজকালকার আইনকানুন যা হচ্ছে, লিখে না দিলেও তোমার সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কথাটা ভেবে দেখো।"

বরুণ ভাবলো। ভেবে ঠিক করলো দাদাকেই সব লিখে দেবে।

ছুটি শেষ হবার আগেই বরুণ তৈরী হয়ে গেল চলে যাবার জন্যে।

দাদা বলেন, "এখনই চলে যাবি? আর দুটো দিন থেকে গেলে হতো না?"

"না দাদা, আর মন বসছে না। তা ছাড়া চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি বলে নিজের বাড়ীতে থাকতেও যেন মনে হচ্ছে পরের বাড়ীতে এসে উঠেছি। তাই ঠিক করেছি আমরা বাইরেই থাকবো"

"কেন, তোর বৌদি কিছু বলেছে বুঝি?"

"না দাদা, তোমরা কেউই কিছু বলোনি। কিন্তু আমার নিজেরই মনে হচ্ছে তোমরা আমাদের আদর করে রাখলেও আমি ঠিক নিজের বাড়ীর মত মিশে যেতে পারছি না। হয়তো এটা একটা ভুল ধারণা। পরে এ ভুল ভাঙ্গলে হয়তো আবার ফিরে আসতে পারি। কিন্তু এখন আমাদের যেতে দাও দাদা।"

"কিন্তু মাঝি বলছিল ঝড় হতে পারে।"

"হোক দাদা, ঠিক করেছি যখন, আমরা কালই চলে যাই।"

* * * *

আকাশ ঘন কালো অন্ধকার হয়ে এল। ঝড় এল। 'এরাল' বিলের মাঝখানে ছোট্ট নৌকো আছাড় খেতে লাগলো। বিরাট বড় ঢেউ-এর পর ঢেউ, তুফানের শন্ শন্ আওয়াজ, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধছে এসে নৌকোর 'ছই'এর ওপর। মাঝি প্রাণপণে দাঁড় টেনে ধরেছে, পারছে না সামলাতে অসহায় নৌকোটিকে।

"ও বাবা, আমরা মরে যাবো", রাজু কেঁদে ওঠে।

"মরবে না বাবা, আমি থাকতে ভয় কিসের তোমার", বরুণ বোঝায়। একপাশে থর থর করে কাঁপছে অমলা। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে।

নৌকো কাৎ হোল, একেবারে জলের উপর হেলে পড়ে গিয়ে আবার বিরাট বড় ঢেউ এর ধাক্কায় সোজা হয়ে উঠলো। মাঝির ছেলে প্রাণপণে ঢেলে চলেছে নৌকোর ভেতরের জল বাইরে। হাত আর চলছে না। এবার বুঝি ডুবলো। ডুবলো নৌকো। ঝড়ের ধাক্কায় কাত হয়ে হয়ে মরা মাছের মত পেট উল্টে ভেসে চলে গেল অনেক দূর। মাঝি আর ছেলে নৌকোর গায়ে লেপটে রইলো।

"অমলা, তুমি রাজুকে শক্ত করে জাপটে ধরে থাকো। ছাড়বে না। আমি তোমাকে ধরছি। ভেসে থাকতে চেষ্টা কর..." বরুণের উত্তেজিত চীৎকার। ঝড়ের আওয়াজে শোনা যাচ্ছে না কিছু। অমলাকে টেনে সাঁতার কাটতে চেষ্টা করছে বরুণ। হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে ডুবে গেল অমলা আর রাজু। ডুব দিয়ে তুলে নিয়ে এল বরুণ আর এগোতে লাগলো পাড়ের দিকে। গায়ের পাশ দিয়ে একটা জলসাপ সাঁ করে সাঁতরে চলে গেল। ভয়ে চীৎকার করে উঠলো অমলা। বরুণও আর পারছে না—পাড় যে অনেক দূর। "ও মাগো, রাজু কোথায় গেল।" হাত ছাড়া হয়ে ডুবে যেতে যেতে বরুণের শক্ত হাতে ধরা পড়লো রাজুর শিথিল দেহ। পেটে জল ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গেল রাজু। "শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরো

রাজুকে” বরুণ চেঁচিয়ে বলে। পাড় অনেক দূর। অমলার দেহ ও শিথিল হয়ে এল। প্রাণপণে টেনে ধরে ওকে ভাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বরুণ। কিন্তু রাজু কোথায়? অমলার শিথিল হাতের আলিঙ্গন খুলে কখন হারিয়ে গেল ওদের একমাত্র সন্তান রাজু! আধমরা হয়ে পাড়ে এসে উঠলো বরুণ। দুহাতে তুলে ধরা একমাত্র অমলার জড় দেহ, রাজু নেই।

ঝড় থামলো, রোদ উঠলো। বিলের জল হয়ে এল শান্ত। পড়ন্ত রোদে লাল হয়ে এল বিস্তৃত বিলের জল রাশি। ওরই তলায় হারিয়ে গেল ওদের রাজু আর বেলে মাটীর উপর পড়ে রইলো অমলার ঠাণ্ডা মৃতদেহ। আর কেউ কোথাও নেই। শান্তি, চির শান্তি।

*   *   *   *

সহরতলীর ছোট্ট বাড়ী, অনেক বড় বাড়ী!

একলা, একেবারে একলা। কিন্তু আমি তো একলা থাকতেই ভালবাসি—বরুণ ভাবে—হ্যাঁ একলাই ভাল। এই ই ভাল, কোন দায়দায়িত্ব, পিছুটান নেই, কোন ঝগড়া নেই, কোন অভাব অনটন নেই, কোন মনের অমিল নেই। বেশ আছি। কিন্তু এত একলা? মাত্র দুটি মানুষ সরে গেল আমার কাছ থেকে তাতেই এত একলা লাগে? অমলা বলতো, আমি নিষ্ঠুর। কারো অভাবেই আমার চোখে জল বেরোবে না। সত্যিই তো। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো বরুণ। নাঃ, কই আমাব একটুও দুঃখ হচ্ছে না তো। শুধু এতবড় বাড়ীটা খালি খালি লাগছে, আর কিছুই নয়। দুটো লোক চলে গেল তো কি হলো? আমিও চলে যাবো এবাড়ী থেকে। তাহলেই তো হলো, তাহলেই তো ভাল। মুক্তি, আজ আমি মুক্ত, একেবারে মুক্ত। একেবারে একলা। এই তো আমি ভালবাসতাম, ভালবাসি। বাসিনা....?

*   *   *   *

পুরুতমশাই এসে ঢুকলেন বাড়ীতে।

"একি, শুনছি বাবা বরুণ? কি সর্বনাশ হয়ে গেল তোমার। শুনে অবধি আমার যে মন ভেঙ্গে পড়েছে বাবা!"

"তা আর কি হয়েছে", বরুণ করুণ হাসি হেসে জবাব দেয়, "দুর্ঘটনা তো সব সময়েই হয়, জলেই হোক আর স্থলেই হোক।"

"তা হয় বটে। সেই জন্যেই তো আমরা গ্রহের কোপ শান্তি করে ওগুলো থেকে বাঁচতে চেষ্টা করি। তুমি নিশ্চয়ই বলবে কই, কোন ফল হলো না তো? তা একটা কথা বাবা। আমি যে গ্রহের কোপের শান্তি করতে চেয়েছি, হয়তো তার চেয়ে বড় কোন শক্তির প্রভাবকে রোধ করতে পারিনি। তাছাড়া বিশ্বাসে মিলায়ে হরি। বিশ্বাস না থাকলে কিছুতেই কিছু হবে না। তা ওদের শ্রাদ্ধ-শান্তি কোথায় করবে ঠিক করেছো?"

"করবোনা", জবাব দেয় বরুণ।

"করবে না মানে? তুমি তোমার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের শ্রাদ্ধ-শান্তি করবে না? ওদের অশান্ত আত্মাকে মুক্তি দেবে না? ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে একি বলছো বাবা বরুণ?"

"আমি তো চিরদিন এরকম কথাই বলে এসেছি ঠাকুর মশাই। আপনাদের ধারণাতে আমি তো নাস্তিক। অদৃশ্য শক্তি, আত্মার অবিনশ্বরতা এসব নিশ্চয়ই সত্য! শুধু আমি বিশ্বাস করতে না পারলে কি হলো? প্রকৃতির নিয়মে জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে। এই প্রকৃতির ধারা এক অতি আশ্চর্য্য জিনিস। আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু কূল পাইনি। কিন্তু কূল পাইনি বলেই এক মহাশক্তির কাছে সব চিন্তার বোঝা নামিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে জড় হয়ে বসে থাকার কোন সার্থকতা আমি বুঝতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও। তাই আমার মনে হয় শক্তি মানেই এই মহতী প্রকৃতির লীলা, আর কিছু নেই।"

ঠাকুর মশাই বলেন, "শুধু তুমি আমি তো কোন ছার, কত হাজার বছর লক্ষ বছর ধরে জ্ঞানী গুণী মুনি ঋষিরা ঠিক এই চিন্তাই করে

এসেছেন। কিন্তু কুল পান নি। তাই সব ধর্মেই গড়ে উঠেছে এক দেবাদিদেব মহাদেব মহাশক্তি শ্রীভগবানের পূজার রীতি। মন যতই খেই হারিয়ে যায়, ভক্তি ততই গভীর হয়ে স্থিতি নেয়। মানুষের মনের সীমা কতটুকু বাবা? তাই সেই মহাশক্তির কাছে পদানত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা ক্ষুদ্র মানব জাতি!"

"তাই তো আমি এই তথাকথিত মহাশক্তির, সামনে মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়াতে চাই, যুদ্ধ করে আমি বিলীন হয়ে যেতে চাই, যাতে আমি বুঝতে পারি এই শক্তির প্রভাব। কিন্তু পারি না তো। হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে মাথা নীচু করে দিতে পারি না তো ভগবানের কাছে। যুদ্ধই নেই তা আর হার-জিৎ কি আছে বলুন?"

"এখানেই তোমার ভুল হচ্ছে। তুমি কি যুদ্ধ করনি? হেরে যাও নি? এই যে তোমার স্ত্রী ও ছেলের অপমৃত্যু হলো, পারলে কি রোধ করতে? সবই সেই মহাশক্তির খেলা, নিয়তির বিচার। ক্ষতি তো তোমারই হলো সবচেয়ে বেশী।"

"দেখুন, ক্ষতিটা একটা তুলনাভিত্তিক অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতির নিয়মে কত প্রাণ জন্ম নিচ্ছে, কত প্রাণের মৃত্যু হচ্ছে। কোন একটি প্রাণের জন্য অভাব বোধকে মনের জোরে জয় করতে পারলেই হলো, তা হলে আর কারও দুঃখও হবে না, কেউ কাঁদবেও না, একটি প্রাণ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।"

"কিন্তু তুমি পেরেছ কি সে দুঃখকে জয় করতে? তোমার অভাব-বোধ হচ্ছে না?"

"না পারিনি। দুঃখ খুবই হচ্ছে। কিন্তু কেন? সেটাই বোঝবার চেষ্টা করছি। যেদিন বুঝতে পারবো, সেদিন আর কোন দুঃখই আমার থাকবে না।"

* * * *

তারপর এল সোনালী।

"না বরুণবাবু, আমি আপনার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসি নি।

আমি জানি এর দরকার নেই আপনার কাছে। আপনার মনে জোর আছে। কিন্তু সান্ত্বনা একটু দরকার আমারই, অমলা যে আমার বড় আপন ছিল।”

“আমারও তো ছিল সোনালী দেবী। আর আমার মনে জোর নেই। তা না হলে কেন এত দুঃখ হয়? কেন এত একলা মনে হয়? অমলার সঙ্গে আমার মনের মিল, চিন্তাধারার মিল কোনদিনই হয় নি। কিন্তু তবুও কেন ওর জন্যে, শিশুটির জন্যে এত অভাব বোধ হয়? আমি একজন মনের সঙ্গী চেয়েছিলাম। আর আপনার মধ্যে পেয়েও ছিলাম। দেহের সঙ্গী আমার আর দরকার নেই, সে প্রয়োজন মিটে গেছে। আর আপনাকে মনের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি ও ভবিষ্যতেও পাবো জানি। শুধু একটু সময় দরকার সোনালী দেবী, দরকার একটু একলা থাকার।”

“আমিও তাই ভাবি বরুণবাবু। দৈহিক কামনা এক সময়ে অল্প বয়সে খুবই জেগে উঠেছিল আর গোপনে তার তৃপ্তিও পেয়েছি কিছু কিছু। কিন্তু বিবাহিত জীবনের পরিণতিতে মাতৃত্ব আর সন্তান-পালন এসব যখন হয় নি সে বয়সে, এখন মনে হয় তার দরকার নেই। এই তো বেশ আছি। মুক্ত আছি। কি হবে জড়িয়ে সমাজের গতানুগতিক গণ্ডীতে? আমি ভেবে ঠিক করেছি বরুণবাবু আমিও চাকরী ছেড়ে দেবো। তারপর কিছুদিন পরে বেরিয়ে পড়বো একলা সারা দেশ ঘুরবো, সব রকম লোকের সঙ্গে মিশবো, মনের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে দেখবো।”

“কিন্তু একলা একটি তরুণীর জীবনে যে অনেক বিপদ আছে? যৌন কামনায় তো মানুষ আর পশুতে খুব প্রভেদ নেই, সোনালী দেবী। কে আপনাকে রক্ষা করবে?”

“কেন আপনি?” জবাব দেয় সোনালী।

অধ্যায় ৬

ওদের দুজনের জীবনে সুরু হলো এক নতুন অধ্যায়, সুরু হলো যাত্রা। কোথায়? কিসের সন্ধানে?

"প্রথমতঃ, আমরা যুদ্ধে বেরিয়েছি," ব্যাখ্যা করে বরুণ, "সমাজের কিছুটা কুটিল, কিছুটা সঙ্কীর্ণ আর কিছুটা অতি প্রয়োজনীয় নীতি আর সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই যে দেখুন, প্রথম শ্রেণীর 'কুপে' তে আমরা একজন পুরুষ আর একজন নারী ভ্রমণ করছি, সমাজের চোখে এটা একটা অশ্লীলতা। কারণ সাধারণ সমাজ এটাকে মেনে নিতে পারে না। ওরা নারী পুরুষের একটা সম্পর্কই বোঝে, সেটা যৌন সম্পর্ক। ভাই-বোনও যদি এক কামরায় রাত কাটায় তবুও কথা ওঠে, চোখের দৃষ্টি বাঁকা হয়। নীতির নামে দুর্নামী হতে হয়। কিন্তু আমরা তো ভাই-বোনও নই। কি সোনালী দেবী, সাহস আছে? না কি রাত্তিরে অন্য কামরায় যাবেন?"

"আছে বলেই তো আপনার সঙ্গে এমনি করে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু দেখবেন, আপনার যে মনের জোরের উপর ভরসা করে আমি এই ঝুঁকি নিচ্ছি, তাতে যেন ক্ষণিকের দুর্বলতা না আসে। যদি আসে তবে তাকে দূরে রাখার দায়িত্বও কিন্তু আপনার। আমি জানি, আমার দেহের একটা আকর্ষণ আছে। পুরুষের চোখে আমি তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিরাও শুনেছি উর্বশী, ঘৃতাচীর আকর্ষণে সাধনা ভুলে যেতেন। অথচ ওদের মনেও তো জোর কম ছিল না। এখন এই অতি আধুনিক যুগের ঋষি আপনি, আপনার উপর দিয়েই একটা পরীক্ষা চলবে। পারবেন তো?"

"আমি ঋষি মোটেই নই, অতি সাধারণ একজন মানুষ, একটু বেয়াড়া একটি মানুষ বলতে পারেন। যদি এই পরীক্ষায় টিকতে

পারি তবেই আমার এই বেয়াড়াপনার সাধনা সফল হবে। আর যদি না হয়? সে আমি এখনও ভাবতে পারি না। আমার এতদিনের আদর্শ, চরিত্রের জোর আর মানসিক স্থৈর্য্য অমলার উত্তেজক উপদেশ আর লোভী পাষাণের কারসাজিতে এক মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়েছিল একদিন মাত্র একশোটি টাকার জন্যে সেটা আমি ভুলতে পারিনা কখনও। ঠিক সেই সময় কোথায় ছিল আমার মনের জোর? পরে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছি, অনেকগুলো টাকাই নির্লিপ্তভাবে তুলে দিয়েছি পুলিশের হাতে। কিন্তু ঠিক যখন দরকার ছিল তখনই আমার মন আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল। যদি আবার দেয়? তখন আপনাকে কে রক্ষা করবে সোনালী দেবী?"

"কেন আপনি বরুণ বাবু," আগের উত্তরের পুনরাবৃত্তি করে আজও উত্তর দেয় সোনালী।

"দ্বিতীয়তঃ, আমরা বেরিয়েছি একটা জিনিস জানতে, বুঝতে আর যদি সম্ভব হয় শিখতে," বলে চলে বরুণ, "এই যে তীর্থস্থানগুলিতে মাথা খুঁড়ে মরছে অগুণতি লোক, ওটা কিসের মোহে, কিসের লোভে, কি জিনিস পাওয়ার আশায়? একমাত্র মনের তৃপ্তি আর মনগড়া একটা সান্ত্বনা ছাড়া কি পায় ওরা? যদি অতিকষ্টে এক তথাকথিত মহাতীর্থে এসে ওরা নিজেদের সঁপে দেয় এক মহাদয়াল, সর্বশক্তিমান, মহামাঙ্গলিকের চরণে, তবে কি ওদের হয় মোক্ষলাভ? কি করে কোথায় কোন পথে হয় সেটা জানি কি আমরা? আর যদি না হয় তবে কি করে কে এই অন্ধ আকুতি ওদের মনে জাগিয়ে তুললো? সে কি স্বার্থান্বেষী চতুর একদল লোভী মানুষের যুগ যুগ ধরে করা কারসাজি, না সত্যিই মহান ধর্ম—পূজারীর ভক্তি ধর্মের সাধনা? আর ধর্মস্থানে তো শুধু ধার্মিকদেরই দেখিনা। এখানে লোভী, অতি লোভী, সাধু, অসাধু, ব্যবসায়ী আর চোর, গুণ্ডা, ডাকাতদের পীঠস্থানও আছে শুনি। আমরা চললাম সব দেখতে, বুঝতে, জানতে। এত পুণ্য, এত পবিত্রতা এই তীর্থগুলোয় আছে বলেই সবাই আসে। অথচ

এটাও তো সবাই জানে যে পার্থিব, আর্থিক ক্ষতি প্রচুর হবে, শারীরিক কষ্টের শেষ থাকবে না। তবুও আসে ওরা অপার্থিব একটা সফলতা পেতে যাকে ওরা বলে পুণ্য। এটা কি একটা মনেরই ভ্রম, না এতে সত্যি কিছু আছে? যদি থাকে তবে তার প্রাপ্তি তো হবে শুধু পরলোকে বা পরজীবনে। কিন্তু এই পরলোক বা পুনর্জন্মের রহস্য সমাধান হয়েছে কি? আমার তো মনে হয় হয়নি। যারা মেনে নিয়েছে তারা নিয়েছে শুধু বিশ্বাসের জোরে। যারা নেয়নি তারা রয়ে গেছে নাস্তিক হয়ে।"

"আমার একটা গান মনে পড়ছে বরুণবাবু,

'চোখেব আলো নিভলো যখন
মনের আলো জ্বেলে,
আমি তখন একলা যাবো চলে।'

যেদিন আমরা একজন একজন করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো তখন কি নিয়ে যাবো? শুধুই কি পর জীবনের আশা, সুখ স্বর্গের কল্পনা? আমার আর একটা কথা মনে ওঠে। যদি স্বর্গ বলে কিছু সত্যিই থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেটা অন্য এক পৃথিবী। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্য এক সুদূর প্রান্তে আর এক সৌরমণ্ডলের কক্ষীভূত আর এক মহাজগৎ। তার সন্ধান তো এই জগতের মানুষ কোন দিনই পাবে না। তবে এই কল্পনা এলো কি করে মানুষের মনে? হয়তো পার্থিব দেহের বাঁধন কেটে কোন মুক্ত আত্মা সে মহাজীবনের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু অমর আত্মায় বিশ্বাস প্রতিপন্ন না হলে তার প্রমাণ পাই কোথায়?"

"হয়তো কোন দিনই পাবো না," বরুণ বলে, "তবুও খুঁজবো। আমাদের এই ছোট্ট জীবনে তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে দেখি। যারা প্রমাণ পেয়েছে বলে দাবী করে তাদের সঙ্গে চলুন আলোচনা করি। কিন্তু, কি হবে? কি পাবো? ওঁরা তো অনেক বড়-বড় ধর্মগ্রন্থ পড়ে বলবেন প্রমাণ আছে এই সব গ্রন্থে। যুগের পর

যুগ ধরে সাধনা, চিন্তা আর ধ্যান করে ওঁরা পেয়েছেন যে জ্ঞান তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন ঐ পুরোণো পুঁথিগুলোতে। কিন্তু তাকে মেনে নিতে, হয় ক্লান্ত হয়ে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, না হয় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের কি সে শক্তি আছে? ওদের তো আছে পেছনের ঐ বিরাট পুঁথিগুলোর সারিতে সারিতে লেখা তত্ত্বকথা। কিন্তু আমাদের কি আছে?"

"আমাদের আছে একটি মন, দুটি মন," জবাব দেয় সোনালী।

* * * *

প্রথমেই এলো ওরা কাশী, বারাণসী, দেবাদিদেব মহাদেব বিশ্বনাথের লীলাভূমি।

"আমরা কোথায় উঠবো বরুণবাবু?" প্রশ্ন করে সোনালী।

"উঠবো আর থাকবো ধর্মশালায়। তবে তার আগে একটা পরীক্ষা করে নিতে চাই। আসুন এই হোটেলটায়।"

"আসুন, আসুন," বলে আপ্যায়ন করে স্বাগত জানালেন বাঙালী ম্যানেজার। অনেক হোটেলই এখানে বাঙালীর। তীর্থযাত্রীরাও যারা হোটেলে থাকেন, তারা বেশীর ভাগই বাঙালী। আর যারা আসে তারা হয় অগুণতি ধর্ম্মশালার একটায়, না হয় পথের ধারে বা মাঠে-ঘাটেই থাকে।

"আমাদের একটা ঘর চাই ম্যানেজারবাবু। তাতে থাকবে দুটি আলাদা খাট-বিছানা। আছে তো?"

"নিশ্চয়ই আছে। কি যে বলেন স্যার, বাংলাদেশ থেকে এসে সপরিবারে সবাই আমার হোটেলেই আসার চেষ্টা করেন। কেন, কোলকাতায় আমাদের হোটেলের নাম শোনেননি?"

"নিশ্চয়ই শুনেছি। তবে মনে পড়ছে না। আমরা কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নই। এমন কি ভাই-বোনও নই। কিন্তু আমরা একটা ঘরেই থাকতে চাই।"

"কেন, বলুন তো?" প্রশ্ন করেন হতবাক্ ম্যানেজারবাবু, "আমার

জোড়া ঘরও আছে, মাঝখানে দরজা খোলা বন্ধ করা যায়, নম্বর আলাদা। সেই দুটো দিয়ে দিই ?"

"না, তাতে চলবে না। একটা ঘরই চাই, আর দুটো আলাদা বিছানা। দেবেন ?"

"না মশাই, ও দিতে পারবো না। আমার হোটেলের একটা নাম আছে, দায়িত্ব আছে।"

"তা আমি জানতাম" বরুণ বলে, "আচ্ছা, আমাদের নৈতিক চরিত্র রক্ষার দায়িত্বও কি আপনার হোটেলের এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ?"

"হ্যাঁ পড়ে। তবে কেন পড়ে তা আর বলবো না, মাপ করবেন। আমি যা বলতে চাই, তা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। তাই বলবো না। তা ছাড়া আমাদেব একটা দায়িত্ব পুলিশের কাছেও আছে, এটা মনে রাখলে ভালো। আপনারা বরং কোন ধর্মশালাতে গিয়ে থাকুন।"

"তাই থাকবো, ওখানেই যাচ্ছিলাম। তবুও আপনাদের একটু যাচাই করে গেলাম আর কি। ফলটা আগে থেকেই জানতাম অবশ্য। আপনাকে একটু অশান্তি দিলাম বলে মনে কিছু করবেন না। আসলে আমরা দুজনে একটা পরীক্ষায় নেমেছি বুঝলেন ?"

"বুঝলাম" বলে ম্যানেজার মাথা নেড়ে অবাক হয়ে কিছুই না বুঝে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন। সোনালী একটু মুচকি হাসলো, বরুণ একটি ছোট্ট নমস্কার করলো, আর দুজনে নিজেদের ব্যাগগুলো হাতে উঠিয়ে নিয়ে ধর্মশালার পথে পা বাড়ালো।

ধর্মশালায় সব ব্যবস্থাই আছে। বিরাট বড় ঘরে যত খুশী বিছানা পেতে বিনা খরচায় থাকা যায়। আর খাটিয়াও ভাড়া পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থানী কর্মকর্তাকে বরুণ বললো ওদের দুটো খাটিয়া দরকার। খাটিয়া পাওয়া যাবে জেনে জিজ্ঞেস করলো ওতে ছারপোকা আছে কিনা।

কর্তা সানন্দে জবাব দিলেন, "প্রচুর আছে, যত চাই তত। সীমাসংখ্যা নেই কত আছে। কেন আপনার কি ছারপোকা ছাড়া চারপাই চাই? তাও আছে। তবে তাতে দশ পয়সা বেশী দিতে হবে।"

"কেন? সেই ব্যবস্থাটা সব খাটিয়াতেই করা যায় না—এক দামে, বেশী দামে?"

"না, যায় না। তা হলে আমার খাট খালিই পড়ে থাকবে বেশীর ভাগ।"

"তাই নাকি? তা ছারপোকা-মুক্ত বা যুক্ত করে কি করে রাখেন এই আলাদা জাতের খাটিয়াগুলো?"

"তা খুবই সহজ। আপনাদের খাটগুলো রোজ রোদে দিয়ে ঝেড়ে আলাদা রাখি। অন্যগুলোয় হাতই দিই না। বুঝলেন, ব্যবসা করতে গেলে অনেক ধান্ধায় করতে হয়।"

"কিন্তু এটা তো ধর্মশালা। ব্যবসার জায়গা তো এটা নয়?"

"কে বললো আপনাকে। আমরা ব্যবসা না করলে আপনাকে তো মাটিতে শুতে হবে? আর ধর্ম নিয়ে ব্যবসা কে না করছে এখানে? আপনি শিউজীর মাথায় ফুল চড়িয়ে আসতে পারবেন বিনা পয়সায়? দেখুন না চেষ্টা করে।"

* * * *

দেখাই যাক, ঠিক করলো বরুণ। সবাই বেলপাতা, ফুল আর মালা নিয়ে ঢুকছে, কাতারে কাতারে লোক, বুড়ো, বুড়ী, ধনী গরীব, অতি গরীব, মাড়োয়ারী, উত্তর প্রদেশী, মাদ্রাজী ও বিদেশী 'হিপি', সবাই স্রোতের মত চলেছে একটি অন্ধকার গহ্বরের দিকে। ভারতীয় হিন্দুদের মুখে একটা জাগ্রত ভক্তিভাব, অন্য জাতের লোকদের আর বিদেশীদের চোখে কৌতূহল, আর বরুণ ও সোনালীর চোখে নির্লিপ্ততা। স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ওরাও এগিয়ে চললো। সোনালী একটা মালা কিনে নিলো, খালি হাতে মেয়েদের খারাপ দেখায়। রাস্তা

বন্ধ। ঠিক মাঝখানে সরু পথের প্রায় সবটাই দখল করে দাঁড়িয়ে আছেন মহাদেবের এক অতি যত্নলালিত বিরাট-বপু ষণ্ড। নির্লিপ্তভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খপ করে সোনালীর হাতের মালাটা মুখে নিয়ে গিলে ফেললো।

"যাক গে ভালই হলো"। বরুণ মন্তব্য করে, "শিবের মাথায় না পড়ে পেটেই পড়লো, আর দক্ষিণাও লাগলো না কিছুই।"

দর্শন করে বাইরে বেরিয়ে এলো বরুণ আর সোনালী। কিন্তু এগোতে পারছে না, সামনেই এক বৃদ্ধা লাঠি ঠুক ঠুক করে চলেছেন অতি কষ্টে। বরুণ ওঁর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলো। বৃদ্ধার অবস্থা দেখে ওদের দয়া হলো। জিজ্ঞেস করলো,

"আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসেননি কেন ?"

"কোথায় কাকে পাবো বাবা। এইতো তোমরা আমাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলে। কাল তো তোমরা আর থাকবে না। কিন্তু আমি আসবো বাবা। রোজই আসবো যতদিন আছি এ জগতে। তারপর একদিন এই তীর্থেই আমার কাশীপ্রাপ্তি ঘটবে। বাবার চরণে এই জর্জর দেহটা বিলিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাবো সংসার থেকে। এর থেকে সুখের সমাপ্তি আর কি হতে পারে বাবা আমার এই ব্যর্থ জীবনের।"

"কেন, আপনার কেউ নেই বুঝি ?" সোনালী প্রশ্ন করে।

"আছে মা, সবাই আছে। কিন্তু আমিই যে নেই। আমি যে জগতের বাইরের একজন হয়ে গেছি। ওদের জগতে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমার ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনী সবাই আছে। বড় সুখে ছিলাম ওদের নিয়ে দুর্গাপুরে। আমার ছেলে ওখানে ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কি যে হয়ে গেল, অনেক অশান্তি হলো। আমি মনের দুঃখে ছেলেকে বললাম—দে বাবা, আমাকে কাশীতেই পাঠিয়ে দে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে এখানে বিদেয় করে দিলে বাবা। সব ব্যবস্থা আগে থেকে করা ছিল, শুধু আমার

বলার অপেক্ষায় ছিল। তা ভালই হলো, আমার আর পিছুটান নেই। এখানেই শেষ জীবনটা উৎসর্গ করে দেবো। জয় বাবা বিশ্বনাথ, বাবা কাশীশ্বর, তুলে নাও বাবা, তুলে নাও—"

বলতে বলতে বৃদ্ধা নুয়ে পড়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পথের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চললো। মুখে একটা তৃপ্তি, নিত্য দর্শনের আনন্দ, সুখ, ভক্তি আর আত্মনিবেদনের আবেগ, সব মিলিয়ে যেন ওর ক্ষীণ ন্যুব্জ দেহে এক বলিষ্ঠ সত্তা একটা আধ্যাত্মিক গরিমা এক অসীম সামর্থ্য জাগিয়ে তুললো।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কাশী থেকে এলাহাবাদ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পুণ্যসঙ্গমে স্নানার্থীদের পূতস্নান। ঐ জলে কি অসীম রহস্য লুকিয়ে আছে?

এবার আর প্রথম শ্রেণীতে নয়, তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা হয়ে গেছে, বরুণ উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ওর মনে একটু সন্দেহ জাগছে। সোনালী কি সত্যিই চেয়েছিল ও পাশ করুক না কি ভেবে-ছিল—আশা করেছিল ও হেরে যাক এই পরীক্ষায়। মেয়েরা কি সত্যি কথা বলে, গহন মনের কথা অনাত্মীয় পুরুষকে? বোধ হয় বলে না। কিন্তু কি করে নিশ্চিত হওয়া যায়? আবার পরীক্ষায় নামতে ভয় করে বরুণের। রেলের অন্ধকার কামরায় নীচের বিছানায় একটি যুবতীর হৃদয়-স্পন্দন, সে কি শুধু হৃৎপিণ্ডের দৈহিক চঞ্চলতা মাত্র! রেল লাইনের ফাঁকে ফাঁকে ইস্পাতের ঘর্ষণের শব্দ, তার সুষ্ঠু ছন্দের দোলা কি শুধু সোনালীর দেহেই লাগছে? মনে নয়? ও প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? যদি সোনালী নিজেই দেয় তবে বরুণ তার মন নিয়ে কি করবে? না, মন শক্ত করবে। দুর্বলতার কাছে মাথা নুইয়ে দেবে না। কিন্তু সোনালী, ওর মন সত্যি কি বলে?

সঙ্গমে প্রথম কাজ অস্থিবিসর্জন। তীর্থে আসছে জেনে সোনালীকে দিয়ে দিয়েছেন ওর কাকীমার অস্থি, পূত সঙ্গমে বিসর্জন দিলে মৃতার আত্মা মুক্ত হবে। সোনালীও না বলতে পারেনি,

অবিশ্বাসের আঘাত দিয়ে ওঁদের মনে দুঃখ দিতে চায়নি। তাই একটা বেতের ঝুড়িতে করে নিয়ে এসেছে। নিরিবিলি সময়ে ওরা দুজনে একটা নৌকো ভাড়া করে এগিয়ে চললো সঙ্গমের দিকে—ঠিক জায়গায় গিয়ে জলে বিসর্জন দিয়ে দেবে, কেউ জানতেও পারবে না।

মাঝনদীতে পাশ থেকে একটা নৌকো এসে পাশে ভিড়লো, আর তার মাঝি একবার তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো "অস্থি হ্যায় রে, আ যাও।"

ব্যস্ আর যায় কোথায়। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে প্রায় দশখানা নৌকো ওদের ঘিরে ধরলো। কারও কাছে ফুল, কারো কাছে বেলপাতা, কারো বা আবার নারকেল, সব নিয়ে পূজো দিয়ে তবেই বিসর্জন হলো অস্থির। পুরুতমশাই দক্ষিণা নিলেন, যে যার জিনিসের দাম নিল আর বিসর্জন করা নারকেল, ফুল পাতা সব তুলে নিয়ে নৌকোগুলো আবার দূরে সরে গেল অন্য পুণ্যার্থীর সন্ধানে। ব্যবসায়ীর ব্যবসা হলো, পুণ্যার্থীর পুণ্য লাভ হলো, আত্মার হলো মহান্ শান্তি, আর বরুণ ও সোনালীর শিক্ষার হলো সমাপ্তি। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত লীলা সাঙ্গ হলো নদীর খরস্রোতে ভাসমান নৌকোর সারিতে।

এই সঙ্গমের বালুচরেই কুম্ভমেলায় হয় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভীড়. হাজার হাজার তাঁবু, হাজার হাজার ভলান্টিয়ার, পুলিশ, আর সেবাসঙ্ঘ, হাসপাতাল, দোকান-বাজার। এখানে এসে জড় হয় চোর, পকেট-মার, গুণ্ডা। এখানে পুণ্যলাভের সঙ্গে হয় চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ আর অঢেল বাণিজ্য। অথচ পুণ্য করতে আসে পাপী-তাপীরা নয়, অতি সাধারণ সরল গরীব দীনহীন জনতা। পাপীরা আসে পাপের বোঝা আরও বাড়াতে, অনেক ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী আসে জনতার অঢেল দানের রত্ন কুড়িয়ে নিতে, আর সত্যিকারের সাধুরা আসেন ধর্মকথা শুনিয়ে পুণ্য দান করতে। তারপর একদিন প্রভাতের পবিত্র লগ্নে লক্ষ লক্ষ দেহ স্নান করে পুণ্য ক্ষণে, পুণ্য সলিলে—মনে

আসে এক সুগভীর তৃপ্তি, মহান শান্তি। পঙ্কিল জল থেকে উঠে এসে বালুচরের উপর দিয়ে ফিরে যায় যে যার দেশে, অন্তরে তীর্থযাত্রার পূর্ণ সার্থকতা নিয়ে।

* * * *

মথুরা, বৃন্দাবন, তারপর হরিদ্বার। খরস্রোতা গঙ্গা হিমালয়ের শত বেষ্টনী কেটে এখানেই প্রথম সমতলের খোলা মাটিতে গা এলিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে তীব্র বেগে। প্রবল স্রোত থেকে রক্ষা করতে স্নানার্থীদের জন্য শান্ত জলের প্রাকার ব্যূহ রচনা করা হয়েছে দেয়াল দিয়ে -'হর্ কী পেড়ীতে'। এখানে সারা দিন পুণ্যস্নান করে শত শত, হাজার ভক্ত। মা গঙ্গার অপার মহিমা সারা শরীরে ও মনে গ্রহণ করে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যস্নান করে। আর পুণ্য অর্জন করে অগুণতি ভিখারীদের একটি করে পয়সা দিয়ে। হরকী পেড়ীর পথের ধারে খুচরো এক পয়সার পাহাড় নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে ব্যবসায়ীরা। কিছু দক্ষিণা দিয়ে একটা টাকা ভাঙ্গিয়ে অজস্র ভিখারীদের প্রত্যেককে মাত্র একটি করে পয়সা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ পুণ্য অর্জন করা যায় একই স্নানযাত্রায়।

হরিদ্বারে আমিষ ভক্ষণ নিষেধ। কিন্তু টাকা খরচ করলে কোন-কিছুরই অভাব হবে না। রাতের অন্ধকারে হাতে হাতে চলে আসবে রান্না করা মাংস, ডিম, এমন কি মদ পর্যন্ত। ব্যবসায়ীরা জাল পেতে বসে আছে সব জায়গায়। সরকারী নিয়ম যত কড়া হয় ততই গুপ্ত পথে বেশী লাভ হয় ওদের। সঠিক স্থানে দক্ষিণা দিলে সব নিয়মই ভাঙ্গা যায়, সে ধর্মের অনুশাসনই হোক বা সরকারী বেড়াজালই হোক। আবার মন যদি না চায় তবে সব নিয়ম আর অনুশাসন মেনে ধর্মরক্ষা করা যায় অতি সহজে, সেটাই তো নিয়ম। আমিষ খেলে পাপ হয়, এ ধারণা যাদের নেই, তাদের, এই বাঙালীদের, তা হলে চোরা পথের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় কি? তাই তো জলের মধ্যে সুপুষ্ট মৎস্য নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে দেখে বাঙালীর জিভে জল!

হৃষীকেশ, লছমন্‌ঝোলা, রুদ্রপ্রয়াগ, হিমালয়ের কোলে কোলে এই অগণ্য মহাতীর্থের নামের মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে ; একটা মোহ টেনে নিয়ে যায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের এই সব ধর্মপীঠস্থানে। কিসের মায়া ওদের মনকে মোহগ্রস্ত করে টেনে নিয়ে যায় পাহাড়ের কোলে ! মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি লাল সিঁদুর গায়ে মেখে পূজা নেয় লক্ষ লক্ষ ভক্তের, অমোঘ শান্তিতে তৃপ্তিতে ভক্তিতে ভরিয়ে দেয় ওদের মন, অন্ধ আকুতির তৃপ্তি হয় দেবতার গায়ে পায়ে দুটি ফুল, দুটি পয়সা ছিটিয়ে দিয়ে। পয়সা কেন ? টাকা কেন ? তারও জবাব আছে পূজারীদের কাছে। ত্যাগ না করলে ঠাকুরের দয়া লাভ হয় না, আর সবচেয়ে বড় ত্যাগই তো অর্থত্যাগ। সে অর্থ কোন্ কাজে লাগে ? তা প্রশ্ন করার অধিকার কারও নেই, নেই বরুণের, নেই সোনালীর। তবুও ওরা প্রশ্ন করে আর যথাযথ উত্তরও পায়। মন্দিরের পরিচালনা, কুষ্ঠরোগীদের আশ্রয়, ওদের ভরণপোষণ, পুরোহিতদের দক্ষিণা, এসব তো ভক্তের দান ছাড়া হয় না। সন্দেহ নিয়ে তীর্থে আসতে নেই বাবুজী। এখানে এসে দিল্ খুলে দিয়ে দান করতে হয়, প্রশ্ন করে সে দানের কদর কমিয়ে দিতে নেই। তা হলে পুণ্য অর্জনের ভাগ কমে যাবে।

*   *   *   *

সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বেজে ওঠে, আরতির ধোঁয়া আর কীর্তনের কলনাদে মোহমায়ার সৃষ্টি হয় তীর্থস্থানের ভবনে ভবনে। ভক্তরা আসে ভীড় করে, ঠাকুর দর্শন করে লাভ করে সুখ, তৃপ্তি, পুণ্য। ভক্তিভরে প্রণাম করে, নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দেয় দেব-মাহাত্ম্যের পদতলে। সারি দিয়ে বসে পড়ে মাটিতে, স্বামীজীর মুখের অমৃত কথা শুনে শুনে মন ভরে যায়। কত মায়া আছে দেব-দেবীর লীলাখেলার 'অমর কাহানী'তে, কত সুখ হয় ঠাকুরদের স্বর্গের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা শুনে, কত তৃপ্তি হয় যখন ভক্তরা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় এক নির্লোভ আত্মদানের মধ্য দিয়ে। এত আনন্দ

এত সুখ তো মহাতীর্থে এসেই পাওয়া যায়। গ্রামে, শহরে, গৃহে গৃহে হাজার কাজের মধ্যে তো এ মহাশান্তি নেই। তাই দলে দলে আসে ওরা হিমালয়ের পুণ্যভূমিতে অন্তরে অসীম ভক্তি নিয়ে।

কেন আসে? বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস। 'বিশ্বাসে মিলায়ে হরি,' আজন্ম সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস যে ওদের মনে গেঁথে আছে শৈশব থেকে। শিশুর কোমরে তামার মাতুলী, কবচ, তারপর একটু বড় হলে স্বাস্থ্যরক্ষার কবচ, আরও বড় হলে ধনদা কবচ। এই আজন্ম সংস্কার বিশ্বাস কি ছাড়া যায়, না কখনও ছাড়বার প্রশ্ন ওঠে? ওঠে না। তাই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে স্যুট পরে কাজে যেতেও কাপড়ের তলায় থাকে মাতুলী, গায়ে পৈতে। কি মহামন্ত্র লুকিয়ে আছে মাতুলীর ভিতরে লেখা ছোট্ট কাগজের টুকরোয়? ঘোড়দৌড়ের বই, লটারীর টিকিট একবার ঠাকুরের চরণে ছুঁইয়ে নিতে হয়, সে ঠাকুর মন্দিরেই থাকুন বা পথের ধারে গাছতলায় সিঁদুর-মাখানো পাথরেই থাকুন। ব্রহ্ম যে নিখিল চরাচরে বিরাজমান। যে কোন স্থানে যে কোন সাজানো পাথরে, যে কোন পবিত্র বটগাছের তলায় দুটি পয়সা ফেলে দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেই তো ঠাকুরের দয়া, আশীর্বাদ পাওয়া যায়—এই অন্ধ বিশ্বাস কি করে জমাট হয়ে থাকে শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার অন্তরে?

এই যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে লোক মোহিত হয়ে আছে এর সুযোগ নিতে কত ভণ্ড, অসাধু 'সাধুবাবা', কত চিত্ত-উদ্ধারিণী 'মা'য়ের উদয় হয়েছে। সাধারণের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওরা ধর্ম-বেসাতির এক একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে! বিদেশে গিয়ে ভোগ লালসা আর তৃপ্তির সাগরে ডুবে অন্যকে পর-জগতের মোহ দেখিয়ে নিজেরা এই জগৎকে উপভোগ করে নিচ্ছে পুরো মাত্রায়।

করুণা হয় এই মোহগ্রস্ত জনতাকে দেখে। এদের মধ্যে বড় ধনীও আছে। তবে গরীবরাই বেশী, কারণ ওদের যে আর কিছুই নেই। ওরা ওদের সামান্য পুঁজি ত্যাগ করতেই শিখেছে, যাতে করে

দেবতার দয়া ঝরে পড়ে গুরুর দয়ায়। যদি ওদের প্রশ্ন করা হয়—'কি পেলে', তবে ওরা কি বলবে? ধনী বলবে, কেন, এই যে ধন পাচ্ছি এ তো তাঁদেরই দয়ায়। গরীব বলবে, এই যে শান্তি পাচ্ছি এতো তাঁদেরই দয়ায়। আছে অভাব, আছে দুঃখ, শোক। কিন্তু পরমাত্মীয়ের মৃত্যু শোক তো জগতেরই রীতি আর অভাব দুঃখ তো আরো বেশী করে আঘাত করতো, যদি দেবতাদের দয়ায় তাদের প্রশমন না হতো। তাই দেবতার পূজারী সেজে, তাঁদের মাহাত্ম্যের চিত্র এঁকে অবোধ জনতাকে ভুলিয়ে রাখে এই অতি বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী বাবা, যোগী আর ঋষির দল।

ধনশালী বিদেশীদের মধ্যে একটা ভক্তি ধর্মের হাওয়া লেগেছে। তাকে মূলধন করে ইয়োরোপ আমেরিকায় শাখা বিস্তার করে, ধর্মের ব্যবসাকে ফলাও করে গড়ে তুলছে এই ব্যবসায়ীর দল। এদের কেলেঙ্কারীর কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এদেশের সংবাদে। আরও প্রকাশ হয় ধর্মগুরুদের ঈন্দ্রজাল দেখিয়ে জনতাকে ভুলিয়ে রাখার কাহিনী।

এই রকম একজন বিখ্যাত 'বাবার' ছবি বরুণ দেখেছিল একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে। ভদ্রলোক আর তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রী দুজনেই বলেছিলেন বাবার ছবি থেকে মধু ঝরে পড়ে। ওঁরা চেখে দেখেছেন। বেয়াড়া বরুণ প্রশ্ন করেছিল "এখানে, এই ছবি থেকে?" জবাব পেয়েছিল, "না এখানে নয়। আমাদের আর সে রকম ভাগ্য কোথায়? অন্য এক মহাভক্ত জনের বাড়ীতে।" আবার প্রশ্ন করেছিল, "দিনে না রাত্তিরে"? উত্তর পায়নি।

এই অগাধ বিশ্বাস কি করে জন্মালো দেখতে এল বরুণ আর সোনালী সেই বাবার স্থানে। ভীষণ ভীড়। কাতারে কাতারে লোক আসছে কত দূর থেকে কত কষ্ট করে, কত ব্যয় করে। কেউ কেউ অতি দুরারোগ্য রোগী নিয়ে, বাবার হাতের স্পর্শে এই ভীষণ রোগ মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবে, বড় বড় ডাক্তাররা যা সারাতে পারেন নি।

কেউ আবার এসেছে শুধু আশীর্বাদ নিতে। বাবা যে ভগবানের অবতার, স্বয়ং ভগবান।

বাইরে লাইন বেঁধে কত মোটর গাড়ী, অনেকগুলো বিদেশী গাড়ী, জাহাজের মত বড় বড়। এদের দেখে মনে আশা জাগে। এই যে বিরাট ধনীরা এসেছেন বাবার চরণে, এদের তো কোন অভাব নেই। তবে কেন, কোন কামনা নিয়ে এরা আসে? নিশ্চয়ই বাবার এমন মাহাত্ম্য আছে যাতে এদের আত্মারও মোক্ষ লাভ হয়, পরজীবনেও এ জীবনের মত সমৃদ্ধি লাভ হয়। স্বর্গের শান্তি আমরা গরীবরাও তো পেতে পারি বাবার দয়ায়। একবার বাবার চরণে নিজেকে সঁপে দিলেই হলো। দূর থেকে তো তা হয় না। বাবার মহান মূর্তি দর্শনে, তাঁর চরণে প্রণামে যে কত পুণ্যলাভ। তাই তো দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে সবাই আকুল হয়ে, তারাই ফিরে গিয়ে বাবার গুণ-কীর্তন করে সারা দেশে বাবার নাম মাহাত্ম্যের প্রচার করে।

বাইরে একটা জায়গায় বেশ ভীড়। বরুণরা এগিয়ে গেল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক বৈজ্ঞানিক বাবার দৈব শক্তির বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা করতে এসে বাইরে ইন্দ্রজাল দেখিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন 'তোমরা যা দেখতে ভেতরে যাচ্ছো, তা এখানেই দেখ, শূন্য থেকে ম্যাজিকের আবিষ্কার জাগতিক বস্তু, টাকা, ফল আর ভস্ম'। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে বিহ্বল মানুষ শুনবে কেন এই বিধর্মী পাপীদের আবেদন। তোমরা বাবাকে মিথ্যে প্রমাণ করে অপমান করতে এসেছো। ভগবৎ শক্তির দান বিভূতি আর তোমাদের ম্যাজিকের ভস্ম একে হলো? সুরু হয়ে গেল ঢিল ইঁট পাটকেল ছোড়া, হুল্লোড়, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি। বৈজ্ঞানিকের দল তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। পুলিশ আসে না। ধর্মস্থানে ওদের ডাক পড়ে না, পড়লেও ওরা ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যাবেই বা কি করে?

সব ভক্তরা তখন ভক্তিভরে বাবার চরণ দর্শনের আশায় দল বেঁধে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকলো এক ফাঁকে বরুণ আর সোনালীও। সঙ্গে

মেয়ে লোক দেখে প্রহরীরা বরুণকে কোন প্রশ্ন না করেই যেতে দিল। বৈজ্ঞানিকদের মত গোলমাল বাঁধানোর লোক যাতে না আসে তার জন্য এই সতর্কতা, প্রহরার ব্যবস্থা। বড় নতুন করে তৈরী করা বিরাট হল ঘরের মধ্যে দড়ি দিয়ে ঘেরা পেছনের জায়গায় ওরা ত্নজনে গিয়ে বসলো। সোনালী মুখের ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো একটা ভক্তি গদগদ ভাব। মাথায় টেনে দিল শাড়ীর আঁচল।

উগ্র ধূপের গন্ধে আমোদিত কক্ষে দামী গালিচার উপরে বালিশে হেলান দিয়ে বিরাজ করছেন বাবা। ছবিতে দেখা সেই হাসি হাসি অমায়িক প্রশান্ত মুখচ্ছবি। পা বাড়িয়ে রেখেছেন ভক্তদের দিকে। পা ছুঁয়ে প্রণাম করার ভাগ্য কজনের হয়? দড়ি দিয়ে বেড়া দেওয়া কক্ষের ওপাশ থেকে ভেতরে আসার উপায় নেই সাধারণ ভক্তদের। স্থধু কয়েকজন বিশেষ ভক্তদেরই সে সৌভাগ্য হয়। ওরা আছেন বাবার পায়ের কাছে বসে। প্রণাম করে বাবার হাতের দেওয়া দেবদত্ত উপহার হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছেন কেউ কেউ। কেউ আবার কোন দেবদেবীর ছোট্ট মূর্তি বা সোনার টুকরো হাতে পেয়ে ধন্য হচ্ছেন।

বরুণ বসে বসে ভাবছে, বাবার হাতে স্থধু ছোট জিনিষই আসে কেন? বড় কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না? ভক্তরা ভাবছে, এসব যে বাবার হাতে দেওয়া ভগবানের দান।

নির্বাচিত ভক্তরা বাবার শ্রীচরণ ছুঁয়ে বিদায় নিলেন। আর দড়ির আগল রইলো না। শিক্ষিত ক্ষিপ্র হাতে চেলারা পথ খুলে দিল সাধারণের জন্যে। সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাবার পায়ের কাছে।

এখন আর বাবার পবিত্র হাতে সোনা রুপো নেই। এখন শুধু স্থপবিত্র ভস্ম, বিভূতি। ভক্তের দল তাই আকুল হয়ে মুখে মাথায় মেখে নিয়ে ধন্য হলো। হলো মহান আশীর্বাদ লাভ। অবতার বাবার হাতে শ্রীভগবানের দেওয়া দান। কি অসীম তৃপ্তি, কি অপার শান্তি!

কি মহিমা বাবার। শূন্যে হাত বাড়িয়েই পেলেন ভগবানের আশীর্বাদ এই বিভূতি। এর কোন জাগতিক মূল্য নেই। আছে দৈবিক মহিমা। বাবার আশীর্বাদে ধন্য হয়ে রইলো পরকাল, পরজগৎ, অমর জগৎ।

* * * *

আমাদের হিন্দুধর্মের মহান সংস্কৃতি। যুগ যুগ ধরে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, লেখা হয়েছে বেদ, উপনিষদ, শাস্ত্রকথায়। আচরিত হয়েছে ঘরে ঘরে অন্তরে বাহিরে নানা প্রক্রিয়া, নানা পূজা অর্চনা, নানা আচার উপচারের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিয়ে আসার অধিকার বরুণকে দিল কে? কেউ দেয়নি, ও নিজেই গ্রহণ করেছে। তাই বড় হয়ে ও পৈতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ও ঠাকুরের কাছে মাথা নোয়ায় না। শুধু দেখে আর ভাবে আর দেখতে দেখতে সারা দেশ ঘুরে বেড়ায়।

* * * *

এই মহাভারত, মহাদেশের প্রতিটি অংশে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে ঘুরে পদচিহ্ন রেখে গেছেন যুগে যুগে কত অবতার, কত ধর্মগুরু, কত দেবসন্তান। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, খাইবার থেকে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র, দেশের কোণে কোণে কত লীলাভূমি ছড়িয়ে আছে পাহাড়ে কন্দরে। কোন গুহায় ভীমসেন এক রাত্রি বাস করেছিলেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকে নিয়ে, যুধিষ্ঠির কোন পথে স্বর্গযাত্রা করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র কোন বনে সোনার হরিণ শিকার করতে বেরিয়েছিলেন, এসব তো কাউকে বলে দিতে হয় না। সবাই জানে আর ভীড় করে আসে সেই পুণ্যস্থানে, প্রণাম করে দেবতার আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিতে। এই বিশাল দেশ। এতে ভ্রমণের তো শেষ হবে না কোনদিন। নিঃস্বার্থ পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর কোন প্রয়োজনই অপূর্ণ থাকবে না ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে। সব ধর্মশালায় আশ্রয় আছে, সব মন্দিরেই প্রসাদ আছে, সব দাতাদেরই দান করে হয় তৃপ্তি, পুণ্য।

তাই অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় কোন কিছুরই অভাব বোধ না করে দেশে দেশে প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে বেড়ালো বরুণ আর সোনালী। ওদের মনের আকুল আকাঙ্ক্ষা, ওদের শত প্রশ্নের উত্তর ওরা পেল কী?

এই দেশে কোটি কোটি মনুষ্যসন্তান জন্ম নিচ্ছে। চরম দারিদ্র্য স্থায়ী অনটনের মধ্যে ব্যর্থ জীবন যাপন করে পার হয়ে যাচ্ছে পর-পারের সার্থক জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। ওরা এজগতে কিছুই পেলো না, নাই পাক। ওদের সামনে আছে এক প্রার্থিত স্বর্গ, দেবতার দয়ায় ওদের সুদূর ভবিষ্যৎ পরজীবন হয়ে আঁছে সুখ আর শান্তিতে সুনিশ্চিত—হয়ে আছে—

"সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্"—।

—শেষ—